922. 12.

(দেশ হিতৈষণার জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যেপড়িবেসেইকরিবে

আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি,
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের বাতি,
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি দিয়ে।

CALCUTTA

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.

1922.

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

রাজবুদ্ধির অর্জ্জন দাসবুদ্ধির বর্জ্জন

বঙ্কিম সমালোচনা

যে পড়িবে সেই করিবে

আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী।

রাজবুদ্ধি পড়লে ইহা বাড়বে জ্ঞানের জ্যোতি,
দাসবুদ্ধি পড়লে প্রাণে জ্বলবে বিষের খ্যাতি,
তবে যদি পড়েন কেহ রাগ বর্জ্জন দিয়ে ;
রাজবুদ্ধি লাভ করিবেন দাস বুদ্ধি দিয়ে।

অনেক জ্ঞানী হিন্দুমুসলমানের সাহায্যে
ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin St. Calcutta.

1922.

FEMALE FRIEND

(ফিমেল ফ্রেণ্ড।)

এই অনন্ত উপকারী মহৌষধির সেবনে ঋতুদোষ, বাধক শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রমণীরোগ সকল সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। প্রসবের পর এই ঔষধ সেবন করিলে সেই জননীতে সূতিকাসম্ভব কোন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে না। প্রসবের পূর্ব্বে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ খুলিয়া যাইবার পর এই ঔষধ উচ্চ মাত্রায় পান করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। প্রথমবারের প্রসূতিকে এ ঔষধে প্রসব না করানই উচিত। তবে ভাল ধাত্রীর হাতে হইলে ক্ষতি হইবে না। এই ঔষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরারোগ্য অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন রোগ সকলের বিবরণ সহ ৫৲ টাকা ফিঃ পাঠাইলে ডাঃ হোসেন সাহেব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধের মূল্যও বেশী ক্রিয়াও বেশী।

হাসেম কাসেম এণ্ড কোং,

৬৩ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দরবার প্রেস

দরবার প্রেসে সকল প্রকার জবের কাজ অতি সুন্দর রূপে ও সুলভ মূল্যে ছাপা হইয়া থাকে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন। বাঙ্গালা ইংরাজী ও উর্দ্দু সকল প্রকার টাইপ প্রচুর পরিমানে মজুত আছে।

S. A. HASHEM, B. A.

Ben. Mc. 922. 1

বঙ্কিম সমালোচনা

আনন্দমঠ বা নন্দের ফন্দী

—:০:—

পাঠক তুমি কে ?

অতি প্রাচীনকালে যে এক জাতি ঈশ্বরাত্মায় আত্ম সমর্পণ করিয়া স্বর্গমর্ত্ত্য ত্রিলোকের রাজ্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তোমরা কি সেই মহাপুরুষদিগের বংশধর ?—যাঁহাদের ভূত ও ভবিষ্যদর্শনের অসীম শক্তি বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াপন্ন করিয়াছিল, তোমরা কি সেই সকল ঐশী-শক্তিধারীদিগের গুণধর পুত্র ?—যে জাতির অহঙ্কার-পূর্ণ বীরদর্পে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল, তোমরা কি সেই সকল মেদিনিদলী বীরদিগের পুত্র ?—যে জাতির বীর ও ধীর কল্পনা, সহস্রাধিক বৎসরের ভাবীকথা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ লিখিয়া মেদিনিমুগ্ধ-কর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তোমরা কি সেই উজ্জ্বল কল্পীদিগের বংশধর ?—যে জাতি ৩৬০ প্রকার শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়া, বিমান ও তাড়িত যন্ত্র সমূহ আবিষ্কার করিয়া জগন্মধ্যে ধন্য হইয়াছিলেন, তোমরা কি সেই সকল গুণধরদিগের গুণবান পুত্র ?—আহা! তোমরা আজ এতদূর পতিত, বুদ্ধিহত, কিংকর্ত্তব্য হারা ও অদূরদর্শী হইয়া পড়িলে কেন? নিতান্ত জঘন্যকল্পী বঙ্কিমবাবুকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ধারণায় স্থান দিয়া বসিলে কেন? তোমাদের এই কুকার্য্যের কুফল, এই সামান্য দিনের মধ্যে যে কিরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তোমরা তাহা তোমাদের ঐ পতিত মাথায় বুঝিতে পার কি ?

তোমরা বুঝিতে পার কি যে, তোমরা যেমনই নিকৃষ্ট-বুদ্ধি হওনা কেন, ভারত-ভূমি তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, এ সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্তা তোমরা ভিন্ন অন্য আর কেহই নহে। ভারতের যাবতীয় উন্নতির ভার তোমাদের মাথাতেই সমর্পিত। তোমরা যদি এরূপ বিকলবুদ্ধি হও, তবে কে এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে প্রদীপ দিবে? আলোর অভাবে, সোনার ভারত যে শ্মশানে পরিণত হইতেছে! ভূত পেত্নীতে পূর্ণ

ভূতেরা বঙ্কিম-নভেলের নায়ক নায়িকা সাজিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তোমরা তোমাদের আবাস-সর্ব্বস্বের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ কি ? ধিক শত ধিক, আক্ষেপ সহস্র আক্ষেপ—সিংহের শাবক শৃগালও নও, কুকুর বিড়ালও নও,—ছুঁচা, ছুঁচা ছুঁচা,—এতদূর অবনতি ! এতদূর উন্মার্গগামী ! এতদূর পতিত !

কেহ যেন বিপরীত মনে না করেন।—আমরা কোন সম্প্রদায় বা জাতির নিন্দাবাদ করিতে দাঁড়াই নাই, কাহার সহিত অসদ্ব্যবহারে অগ্রসর হই নাই, কাহার কুৎসা করিয়া ধন্য হইতে চাহিনা, অথবা সর্ব্বসাধারণকে উদভ্রান্ত করিয়া ধন ও মান অর্জ্জনের পথ খুঁজিতেছি না।—ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিয়া এবং ভূত হিন্দুদের চরিত্র পাঠ করিয়া, আমাদের হৃদয়সাগরে যে সকল ভীষণ অশণিবাণ নিপতিত হইতেছে, এবং তজ্জনিত উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালায় আমাদের প্রাণপাখী যেরূপে চঞ্চল ও আক্ষেপে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে,—ইহা—আমদের—সেই—উচ্চ আক্ষেপের—বিষপ্রসবী উচ্ছ্বাস মাত্র। এই মহা উচ্ছ্বাসের বাতাস যদি বঙ্গবাসীর প্রাণস্পর্শ করিতে পারে, তবে আমাদের আজন্মের শ্রম সফল হয়।

১ ❋ বাঙ্গালীরা পতিতবুদ্ধি কেন ? ❋ ১

পৃথিবীর মধ্যে এসিয়া খণ্ডই ধর্ম্মস্থল। আবার তন্মধ্যে ভারতবর্ষই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লীলাভূমি। অতএব ভারতবাসী ইহজগতের কেহ না হইলেও, অন্তর্জগতের মহামনস্বী। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতের সেই দৃঢ়-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এ সময়ে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে পাপ পরিত্যাগ করাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ অনেক রূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই পাপ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন,—ভারতের ভাগ্যাকাশে কলির আবির্ভূতি, এবং পুণ্যের প্রস্থান ও পাপের আগমন অনিবার্য্য।

সেই মহাযুদ্ধে সমগ্র এ্যাসিয়াবাসী যোগদান করিয়াছিল, সেহেতু যুদ্ধের অবসানে সমগ্র এ্যাসিয়াতেই ধর্ম্ম শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। এবং সে যুদ্ধে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে, কতিপয় বালকবালিকা, বৃদ্ধাবৃদ্ধ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই সময়ে সৃষ্টি-ধ্বংস-কারী আগ্নেয়অস্ত্র সকল উঠিয়াযায়, যাহার ফলে সেই সময় হইতেই এ জাতি ভীরু হইতে আরম্ভ করিয়া, একালে কাপুরুষে পরিণত হইয়াছে।

ভূতেরা বঙ্কিম-নভেলের নায়ক নায়িকা সাজিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তোমরা তোমাদের আবাস-সর্ব্বস্বের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ কি ? ধিক শত ধিক, আক্ষেপ সহস্র আক্ষেপ—সিংহের শাবক শৃগালও নও, কুকুর বিড়ালও নও,—ছুঁচা, ছুঁচা ছুঁচা,—এতদূর অবনতি ! এতদূর উন্মার্গগামী ! এতদূর পতিত !

কেহ যেন বিপরীত মনে না করেন।—আমরা কোন সম্প্রদায় বা জাতির নিন্দাবাদ করিতে দাঁড়াই নাই, কাহার সহিত অসদ্ব্যবহারে অগ্রসর হই নাই, কাহার কুৎসা করিয়া ধন্য হইতে চাহিনা, অথবা সর্ব্বসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ধন ও মান অর্জ্জনের পথ খুঁজিতেছি না।—ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিয়া এবং ভূত হিন্দুদের চরিত্র পাঠ করিয়া, আমাদের হৃদয়সাগরে যে সকল ভীষণ অশণিবাণ নিপতিত হইতেছে, এবং তজ্জনিত উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালায় আমাদের প্রাণপাক্ষী যেরূপে চঞ্চল ও আক্ষেপে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে,—ইহা—আমদের—সেই—উচ্চ আক্ষেপের—বিষপ্রসবী—উচ্ছ্বাস মাত্র। এই মহা উচ্ছ্বাসের বাতাস যদি বঙ্গবাসীর প্রাণস্পর্শ করিতে পারে, তবে আমাদের আজন্মের শ্রম সফল হয়।

১ * বাঙ্গালীরা পতিতবুদ্ধি কেন ? * ১

পৃথিবীর মধ্যে এ্যাসিয়া খণ্ডই ধর্ম্মস্থল। আবার তন্মধ্যে ভারতবর্ষই ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ লীলাভূমি। অতএব ভারতবাসী ইহজগতের কেহ না হইলেও, অন্তর্জগতের মহামনস্বী। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভারতের সেই দৃড়-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। এ সময়ে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনকে পাপ পরিত্যাগ করাইবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ অনেক রূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই পাপ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন,—ভারতের ভাগ্যাকাশে কলির আবির্ভূতি, এবং পুণ্যের প্রস্থান ও পাপের আগমন অনিবার্য্য।

সেই মহাযুদ্ধে সমগ্র এ্যাসিয়াবাসী যোগদান করিয়াছিল, সেহেতু যুদ্ধের অবসানে সমগ্র এ্যাসিয়াতেই ধর্ম্ম শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। এবং সে যুদ্ধে এত লোকক্ষয় হইয়াছিল যে, কতিপয় বালকবালিকা, বৃদ্ধাবৃদ্ধ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই সময়ে সৃষ্টি-ধ্বংস-কারী আগ্নেয়অস্ত্র সকল উঠিয়াযায়, যাহার ফলে সেই সময় হইতেই এ জাতি ভীরু হইতে আরম্ভ করিয়া, একালে কাপুরুষে পরিণত হইয়াছে।

জাতি, এক দেশব্যাপী হুজুগ তুলিয়া সকলেই সেই ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময়ে মহাপ্রভু সঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া, কি ভাবে এই সরল-বিশ্বাসী জাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সুধীব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। তিনি তখন এই শিথিলবুদ্ধি জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পুনরায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত করিলেন। কাজেই পূর্ব্বে এ জাতির যেরূপ ধর্ম্মভাব ও আচরণ আদি জ্ঞানগুণ ছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম পরিভ্রমণ করিবার পর আর তেমন রহিল না। যদি এই শঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে আবির্ভূত না হইতেন তবে (চিন্তা করিয়া দেখুন) এ জাতি, চীনা ও বর্ম্মীদের মত নর্দ্দমার কীটখোর জাতিতে পরিণত হইত কি না!

এই পাপ পরিলিপ্ত দেশে পৃথ্বীরাজের রাজত্ব কালে, এ্যসিয়া খণ্ডের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান মোসলেম সম্প্রদায়, পৃথিবীর নানা দেশ জয় করিবার পর, ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সে সময়ে ভারতবাসীরা ধর্ম্ম ও সত্য-স্বাধিনতা হারাইয়া সমগ্র দেশকে পাপের কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিয়াছিল। মুসলমানদের ভয়মৈত্রতায় নিপতিত হইয়া, যখন এই জাতি আবার হুজুগে মাতিয়া এসলাম কবুল করিতে লাগিল; তখন এই জীর্ণ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য মহাপ্রভু বল্লাল সেন 'নবধা কুল লক্ষনম্' করিলেন। তিনি যদি এই সরল বিশ্বাসী জাতিকে এইরূপ এক দৃঢ় বন্ধনে পরিবন্ধন না করিতেন, তবে মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বঙ্গদেশ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একাকার ধারণ করিত। এই সময়ে রাজনীতি বিশারদ ভারতসম্রাট আকবর, এই পতিত জাতিকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিলেন। তারপর এই জাতি মক্কা ও মদিনা আদি মোসলেম তীর্থস্থলে গমন করিয়া, তথায় এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে চৈতন্যদেব ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া, শ্রুতিমধুর মৃদঙ্গ ধ্বনি ও নব্য স্মৃতিশাস্ত্রে দেশ কাঁপাইয়া, এই বুদ্ধিবিহীন জাতিকে উদ্ধার করিলেন। সমুদ্রপথে গমন করা নিসিদ্ধ ও পাপের কার্য্য বলিয়া রঘুনন্দন শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়া দিলেন; তাহাতে এ জাতির এসলাম-অনুরক্তি বহুপরিমাণে কমিয়া গেল। নচেৎ আজ ইহলোকে হিন্দু-দেবালয় দর্শন-গোচর হইত না। ফলকথা এই জাতির উপর বহুবার বহুপ্রকারের বিপদ উপস্থিত হওয়ায়, এবং ইহারা নানা সময়ে নানাপ্রকার বিড়ম্বনা সহ্য করায়, সম্প্রতি ইহারা এমন ভীষণ ভাবে পতিত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন ইহাদের হিতাহিত জ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জ্ঞানগর্ভী-কল্পনা, দূরবীক্ষণ শক্তি আদি আত্মার মূল্যবান অলঙ্কার

পরিশেষে যখন এই রাজ্য ইংরাজদের হইল, তখন ইংরাজেরা এই জাতিকে ৭০ বৎসর যাবৎ রাজ সরকারে কোনরূপ চাকরী না দেওয়ায়, এ জাতির আর্থিক-অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া গেল যে, সেই কঠিন সময়ে পুরুষেরা দস্যুতা ও রমণীরা অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া তাহাদের ঘৃণার জীবন পালন্ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

৭০ বৎসর পর ইংরাজেরা এই জাতিকে রাজকর্ম্মচারী রূপে গ্রহণ এবং কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া শ্রুতিদান করিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কৌশলকর কার্য্যকলাপে ও রাজনৈতিক চালে ফেলিয়া, এই জীর্ণ জাতির ধর্ম্মভাব এমন সুন্দর ভাবে ধীরে ধীরে ভুলাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এই জ্ঞানহীন জাতি ধর্ম্মের সমুদায় অংশ হারাইয়াও, ইংরাজের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিল না। মুসলমানেরা এই জাতির ধর্ম্মে হাত দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাদের স্পৃহায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইংরেজ ইহাদের স্পৃহায় অগ্নিদান করিয়া এমন ভাবে ভষ্মীভূত করিয়া দিলেন যে, হিন্দুমধ্যে ধর্ম্মের-স্পৃহা আদৌ রহিল না। এই সময়ে গ্রন্থকারগণ অর্থের লালসায় ইংরাজী চালচলন ও আচার ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া, এবং ইতিহাস আদি দেশবাসীর ধর্ম্মকর্ম্ম ও আচার ব্যবহার প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া, এমন এমন গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন যে, তাহার পাঠে এই চির পতিত জাতি একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত ও ধর্ম্মকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া গেল। এই সকল গ্রন্থকারের মধ্যে, বঙ্কিমবাবুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কতিপয় নভেল লিখিয়া তন্মধ্যে এই জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম আচার ব্যবহার এবং রমণীদের সতীত্ব ও অভিরুচি প্রভৃতি, এমন কৌশলকর বচনবিন্যাসে, এতদূর নিকৃষ্ট, অরুচ্য ও জঘন্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে অপর জাতিরও গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সরলবিশ্বাসী জাতি, বঙ্কিমবাবুর দুষ্কল্পনায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া, একমাত্র ভাষায় ভুলিয়া, ঐ সকল গ্রন্থের উপাসক সাজিয়া বসিলেন। গ্রন্থগত কুৎসিত কল্পনা ও অরুচ্য চালচলন সকল, ভাষারূপ-সিমেণ্টের বলে পতিতবুদ্ধি পাঠকদের দুর্ব্বল মাথায়, এমন জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল যে, তাহার উচ্ছেদ এককালে অসম্ভব হইয়া পড়িল। ফলে তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, হিতাহিত-বোধ ও কল্পনা প্রভৃতি আচার ব্যবহার সকল, গ্রন্থগত কল্পনার অনুকরণে দুষিত ও বিকৃত ভাব অবলম্বন করিল। এইরূপ দুষ্যবুদ্ধি ও অসার মস্তিষ্ক লইয়া নিজেদের উন্নতি করাতো দূরে থাক, অন্যান্য জাতির উন্নতি পথের কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (শত্রু হইলেও প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগিলে নিজের আবাস রক্ষা করিবার মানসে যে অনলে জল ঢালিতে হয়।)

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে,—এই জাতি বহুবার ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিবারেই এক এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, ইহাদের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। এইবার এই ইংরেজ-আমলে বঙ্কিমবাবুর গর্হিত-কল্পনার-কীট সাজিয়া, এ জাতির যে এক মহা শিরোরোগ দেখা দিয়াছে, তাহা আরোগ্য হইবার উপায় দেখিতেছি না। শিরোরোগ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর রোগ আর নাই, কেন না এ রোগের ঔষধ থাকিতেও নাই। মাথা-পাগলা রোগীরা ভীষকের ঔষধ সেবন করা দূরে থাক, ভীষকের শিরোরোগ জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ঔষধ দিতে উদ্যত হয়।—তবে কি এই রোগেই এ জাতি ধরা হইতে মুছিয়া যাইবে? ভীষক আসিয়া 'অহিংসা অসহযোগের' পুরিয়া হাতে করিয়া রোগীদের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। রোগীরা, ভাঙে বিভোরা শৈবলিনীর ন্যায় ভীষককে জিজ্ঞাসা করিতেছে—'তুমি কি লরেন্স ফষ্টার!—পলাও পলাও, প্রতাপ (অর্থাৎ বঙ্কিম-কল্পনা) তোমার সর্ব্বনাশ করিবে।'

ইতিপূর্ব্বে আর এক বহুদর্শী ভীষক আসিয়াছিলেন। রোগীরা তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। 'তুমি কি সত্যানন্দ?—তোমার বোমা বারুদ ও আনন্দমঠ আছে কি?—আমরা তোমার সঙ্গে সেই আনন্দপূর্ণ স্থানে যাইব। তুমি অন্যদিকে লইয়া গেলে, যাইব না, অথচ তোমাকে অপমান করিব।'

শৈবলিনী সদৃশ এই সকল রোগীদের মস্তিষ্করূপ ভাণ্ড, যে সকল বঙ্কিম-কল্পনা-রূপ সিদ্ধি, গাঁজা, চরশ আদি ভাণ্ডের ভণ্ডামিতে পূর্ণ হইয়া আছে, এবং যাহার সেবনে ইহারা এইরূপে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, সত্যস্বামীকে ত্যাগ করিয়া ফষ্টারগত হইয়া আছে, সেই গুপ্ত কথাগুলি কোন ভীষকই উদ্ভাবন করিতে পারিতেছেন না। এই ভাণ্ডগুলি জলসাৎ করিতে পারিলেই যে রোগী আপনা আপনি আরোগ্যলাভ করিবে, সে কথা কেহই চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। আর এই গুপ্তগাঁজার সন্ধান কেহই ভীষককে বলিয়া দিতেছেন না। বলিবেনই বা কে? সকলেই যে ঐ গাঁজায় উন্মত্ত!

দ্বিতীয় ভীষক মহাশয়, রোগ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা সিদ্ধি গাঁজা ও সুরা চরশে এমন হইয়াছে, তাই তিনি নেশার দোকানে পাহারা বসাইলেন; কিন্তু বঙ্কিমবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ, মাথার কেন্দ্রস্থলে যে সকল দোকান সাজান আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া এবং সে দিকে পাহারা না বসাইয়া, নগরের চতুর্দ্দিকে বসাইলেন। যাহার ফলে আমরা একটা হুজুগের ফার্স দেখিলাম মাত্র,

আমরা তাহার অনুসন্ধান বলিয়া দিলাম, যদি রাজবুদ্ধি মাথায় থাকে তবেই তো এ সকল স্থলে পাহারা বসিবে। গোলামবুদ্ধি হইলে, কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

২ ❋ বুদ্ধিক্ষেত্রে বীজ। ❋ ২

পরমেশ্বর আমাদের মাথায় মাথায় মস্তিষ্ক দিয়াছেন। এই মস্তিষ্কই আমাদের বুদ্ধি জন্মিবার ক্ষেত্র স্বরূপ। যে মস্তিষ্কক্ষেত্রে যেমন বীজ পড়িবে সে ক্ষেত্র সেইরূপ বৃক্ষ উৎপাদন করিবে। এই বীজের কারণেই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ সবল ও রাজবুদ্ধি, কেহ কেহ দুর্ব্বল ও দাসবুদ্ধি; কেহ কেহ বীর ও গম্ভীরবুদ্ধি, কেহ কেহ সূক্ষ্ম ও দূরবীক্ষণ বুদ্ধি, কেহ কেহ কূট ও ফন্দিময় বুদ্ধি, কেহ কেহ অত্যাচার ও লালসায় স্বার্থপর বুদ্ধি, কেহ কেহ নিরেট ও নীরস বুদ্ধি, কেহ কেহ সুমার্জ্জিত, সরস ও উৎপন্নাদি তাৎপর্য্যময় বুদ্ধি, কেহ কেহ উদ্‌ভ্রান্ত ও বিচলিত বুদ্ধি, কেহ কেহ ভাবময় বুদ্ধি, কেহ কেহ তৎপরবুদ্ধি এবং কেহ কেহ ধীরবুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধি পাইয়া সংসার ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছি। অতএব বুদ্ধিক্ষেত্রে যেরূপ বীজ পড়িবে, তথায় সেইরূপ বৃক্ষই দৃষ্ট হইবে।

বঙ্গদেশখানি যেমন উর্ব্বর, বঙ্গীয় মস্তক সকলও তেমনি উর্ব্বর, তবে কি না উত্তম বীজের অভাবে ইহা সুন্দরবনে পরিণত হইয়া আছে। কবিরাই এই সকল বীজের ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিকবর্গ, দেশ ভ্রমণে-ভগ্নপদ হইবার কারণে, তাঁহারা দেশদেশান্তরের জ্ঞানগর্ভী বীজ সকল আনিতে পারেন না, কাজেই কণ্টক তরুর বীজ সকলকে, বচন বিন্যাসের মহিমা দেখাইয়া, আমাদের নিকট কাবুলী মেওয়া, বাসরার গোলাব এবং যুক্তরাজ্যের তর্ব্বুজাদির বীজ বলিয়া বিক্রয় করেন। তাহার পাড়া-তোলপাড়করী ছড়ায় ভুলিয়া আমরা সেই কণ্টক তরুর বীজগুলি ক্রয় করিয়া মস্তিষ্ক-ক্ষেত্রগুলিকে কণ্টকবন করিয়া রাখিয়াছি। পক্ষান্তরে যাঁহারা এই বীজ না লইয়া, কেবল বিলাতী ও বিদেশী বীজের অর্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের মাথায় কাবুলী বেদানার স্থলে টকো ডালিম ফলিতেছে।

বঙ্কিমবাবু তদীয় বীর-বচন-বিন্যাসে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া, আমাদের নিকট যে সকল বীজ বিক্রয় করিয়াছেন, সেই দুষ্য বীজের দোষে আমাদের মস্তিষ্কের বুদ্ধি ও কল্পনা সকল এককালে বিকৃত ও আকৃতি-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।—৪০ বৎসর পর্য্যন্ত লোকের

রজ্জুবন্ধনে যেরূপে বাঁধিবে, ফলটি সেই বন্ধনের বশীভূত হইয়া হাঁড়ি এবং কলসী আদি সেতার খোলের আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এই রজ্জুবন্ধনের বিবিধ নিয়মের বশীভূত হইয়া, মাষ্টার মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়, পাদ্রিপ্রবর ও মৌলুভি সাহেব, ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত হওয়া সত্তে, পরস্পরে ভীষণ ভাবে মতভেদ হইয়া থাকেন।

বঙ্কিমবাবুর কল্পনা সকল, মনুষ্য কল্পনার অন্তর্গত নহে। ঐ সকলের পাঠে আমরাও আমাদের, জ্ঞানগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, ধারণা, কল্পনা ও হিতাহিত জ্ঞান সকল এককালে বিকল করিয়া তুলিয়াছি; আমাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক বর্ব্বরতার বর্ব্বলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। বিপরীত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া আমরা দুর্ব্বল হইয়া বীর, অজ্ঞান হইয়া জ্ঞানগম্ভীর, দুষ্ট হইয়া শিষ্ট, কৃপণ হইয়া দাতা, কাপুরুষ হইয়া দাম্ভিক শাস্ত্রী, কামুক হইয়া ইন্দ্রিয়বিজয়ী, ভ্রষ্টা হইয়া সতীসাবিত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছি।— তবে বল আমাদিগকে কে আঁটিয়া উঠিবে? অমরা বাক্যবীর, ভাষা পাঠে কাকাতুয়া, কল্পনার কেহই নহি। গলাবাজীই অমাদের যাবতীয় জ্ঞানগুণ।

জ্যোতির দর্শনে অন্ধ পতঙ্গ যেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া, জ্বলন্তঅনলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থসকল সেইরূপে, বচন বিন্যাসের জ্যোতি দেখাইয়া, আমাদিগকে এমন অন্ধ, অজ্ঞান, কাণ্ডহীন ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়াছে যে, আমরা সেই অনন্ত অনলে পড়িয়া পুড়িয়াছি, পুড়িতেছি, এবং পুরুষানুক্রমে পুড়িতে থাকিব তথাপি, আমাদের ভ্রমভরা গতিমতি কিছুতেই ফিরিবে না। বসুমতী কর্ত্তৃক এই গ্রন্থাবলীর প্রচুর ও সুলভ প্রচারের পর হইতেই, বঙ্গের প্রত্যেক আবাস বর্ব্বলশোভী হইয়া যায়। এই কণ্টকের প্রাণজ্বরাজ্বালা 'অর্থাৎ বঙ্কিম পড়া সন্তান সকলের বৈতালিক উৎপাত' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিদৃষ্ট হইতেছে।

এই সোনার ভারতে সহস্র বৎসর ধরিয়া জেলায় জেলায়, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, চালে চাল ফেলিয়া আমরা হিন্দু-মুসলমান বন্ধু সহোদরবৎ, অপার শ্রদ্ধাভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও ভ্রাতৃভাবে খুড়া ভাইপো আদি নানা সুবাদে গ্রথিত হইয়া, পরমসুখে বাস করিয়া আসিতেছি। আমরা কখনই জানিতাম না যে, আমাদের মধ্যে একদল ম্লেচ্ছ বা নেড়ে এবং অন্যদল কাফের। আমরা এই মহাকথার তত্ত্ব নভেল ঠাকুরের নিকট হইতে পাইয়াছি, তিনি আমাদের নয়নের ভ্রমরাশি দূর করিয়া দিলে, আমরা এখন মুসলমানদিগকে ঘৃণার ভাজন

প্রাণকে জারিয়া রাখিয়াছি। একদিন যাঁহাদিগকে সম্মানের উচ্চতম স্থলে বসাইয়াছিলাম, আজ তাঁহাদের ছায়া মাড়াইলে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকি।

আমাদের চক্ষুদাতা, জ্ঞানদাতা, বিদ্যা-বুদ্ধি-দাতা ও কল্পনা-দাতা কবি ঠাকুরের অপার কৃপায়, আজ আমরা কল্পনায় শার্দ্দূলবিজয়ী বীর হইয়াছি, গোপনে তোপ গোলা নির্ম্মাণের কৌশল পাইয়াছি। জাল সন্ন্যাসী ও দুষ্ট ব্রহ্মচারী সাজিয়া বনে বসিয়া দস্যুতা করিতে পারিলেই যে, রাজ্য জয় করা যায়, এমন সহজ উপায় ও সরল পথ, কে কবে আমাদিগকে শিখাইতে পারিয়াছিল?—আমাদিগকে এমন অহঙ্কারী, দাম্ভীক ও শক্তিশালী কেহ কখন করিতে পারিয়াছিল কি? কেমন করিয়া ইংরাজের মুখে ঘুসি মারিতে হয়, কেমন করিয়া হিন্দুরাজ্য গড়িতে হয়, কেমন করিয়া মেঘঝড়ের কৃপায় ইংরাজকে বন্দী করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, সকল কথাই এখন আমাদের চক্ষের উপর নাচিতেছে। আমাদের মত ত্রিলোকদর্শী মহাপুরুষদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে সে আবার কে?

যদি কোন ব্যক্তি এমন ভাবেন যে, মোসলেম শার্দ্দূলদিগের এসলামী [illegible] হইতে রক্ষা করিবার জন্যই, এই গোবৎ জাতিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার মানসে, নভেল ঠাকুর ঐ মন্ত্র আওড়াইয়াছিলেন; তাহাতে আমরা বলিব, বৃটিশসিংহের দর্পে বাঘ সকল ছাগ হইয়া যাইবার পর, ঐ মন্ত্র আওড়াইয়া তিনি সেইরূপ অনিষ্ট করিয়াছেন, 'সমুদ্র পথে গমন নিষিদ্ধ' কথাটা, একাল পর্য্যন্ত জারি রাখিয়া হিন্দুমধ্যে যেরূপ অনিষ্ট ও বুদ্ধিদোষ ঘটিতেছে।

সাহিত্য অর্থাৎ যাহা সঙ্গে সঙ্গে যায়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থগুলি, সাহিত্য ও রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবার কারণে, ঐ সকল গ্রন্থে রচিত হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম আদি রুচি ও স্পৃহা সকল, আমাদের সঙ্গের চিরসঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরাও ঐ সকল নভেলগত দুষ্ট নায়ক নায়িকাদের অনুকরণে গঠিত হইয়াছি। এক বেলা খাইবার সঙ্গতি নাই, ফুলবাবু সাজিয়া সমীরণ সেবন করিতেছি। অনন্ত ভ্রান্তির সমুদ্রে ভাসিয়া, হিতাহিত জ্ঞান ও আত্মার গুণরাশি ধুইয়া মুছিয়া জলে ভাসাইয়াদিয়াছি। এবং অত্যাচার করিতে ও অনিষ্ট-সাধনে প্রাণপণ করিয়াছি। শত বিষয়ে ভ্রান্তিমান ও বিপথগামী হইয়াও নিজকে শতজ্ঞানে জ্ঞানী, ও সহস্র-গুণে গুণবান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছি। ভূত ভুলিয়াছি, ভবিষ্যৎ ভাবিবার শক্তি হারাইয়াছি। আয়েশার মত দুষ্ক্রিয়া করিয়াও গুরুজনের সম্মুখে

নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনি এবং অবশেষে অন্যের অনুগ্রহ লইয়া জীবন কাটাই। বীরেন্দ্রসিংহের মত গণিকাকে গৃহে স্থান দিয়া সেই লজ্জাবহ কুলের গরিমা দেখাই। অভিরামস্বামীর মত শত পাপে কলুষিত হইয়াও পরমহংস সাজিয়া বসি। সীতারামের মত বৃক্ষারূঢ়া রমণীদের জন্য পাগল হইয়া বেড়াই। তোরাবের মত উৎকোচ গ্রহণে কখনই কাতর নহি। সম্পত্তি দেখিলে রজনীর মত অন্ধ ও প্রফুল্লের মত ডাকাতিনীকেও আবাসে আনিতে পারি। পিতার যথাসর্ব্বস্ব জলে দিয়া মৃণালিনীকে লইয়া বেনের ব্যবসায়ে কাল কাটাইতে শিখিয়াছি। এইরূপ জিবনী গ্রহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে পদচিহ্ন-গ্রামের-ন্যায় মরুভূমি করিয়া ছাড়িয়াছি। কেহ রাজ্যের প্রলোভন দেখাইলে তখনি লেখাপড়া ছাড়িয়া সেই সত্যানন্দের দলে যাইয়া ভর্ত্তি হইতেছি। হিন্দুরাজ্য গঠিত হইবে শুনিলে অমনি সীতারামের প্রজা সাজিতেছি। কিন্তু সীতারাম যে কেন জয়ন্তীকে উলঙ্গ করিতে চাহিল, সে কথা নভেল ঠাকুর বলেন নাই, আমরাও উদ্ভাবন করিতে পারি না।

সাহিত্য পুস্তক সকল যে কিরূপে পাঠকদিগের জীবন গঠিত করিয়া থাকে, বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থগুলির সহিত বঙ্গবাসীদের ইদানীন্তন চালচলনের সহিত মিলাইয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে কণা মাত্র বাকি থাকিতে পারে না।—এই সকল উন্মার্গ-গামী লোকেরা দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় কি? * সাহিত্যগ্রন্থের গ্রন্থকার এবং সংবাদপত্রের এডিটার, ইঁহারা যেমনই পণ্ডিতপ্রবর হউন না কেন, যদি ভুবনভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁহাতে না থাকে, তবে তাঁহাদের কল্পনায় দোষ থাকিবেই থাকিবে। হুজুগী কবীদের গ্রন্থ পাঠ করিলে, পাঠকদের মস্তিষ্ক এতদূর বিকৃত হইয়া দাঁড়ায় যে, উপরোক্ত রূপে তাঁহাদের ভ্রম সকল দেখাইয়া দিলেও তাঁহারা দেখিতে পায় না। বরং তাঁহারা এইরূপে সত্যমিথ্যায় প্রতিবাদ করিতে দাড়ায়—

শৈবলিনী শান্তিমণি, পদ্মাবতী প্রফুল্ল, সূর্য্যমুখী, হীরা, শ্রী, রমা, বিমলা, তিলোত্তমা ইত্যাদি, যিনি ইহাদিগকে অসতী বলিবেন তিনি নিজে অসৎ। ইহাদের দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগ যে কত অধিক ছিল, সে কথা যাহারা বুঝিতে পারে না; তাহারাই উহাদিগের নিন্দা করে। আমাদের কুলকামিনীরা ঐ ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহা ভাল কি মন্দ সেকথা সে বুঝিতে পারে কি? স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে হইলে, রামায়ণ মহাভারত আদি গীতার অনুকরণে জীবনকে গঠিত করিলে চলিবার নহে। ঐ সকলের পাঠে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেশাত্মবোধ ও

উৎকোচপ্রিয়, ইন্দ্রিয়বিজয়ী ধার্ম্মিক, সূক্ষ্মদর্শী, বীরবক্তা ও হুজুগপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন? সেইজন্য যে কেহ বঙ্কিমবাবুর নিন্দাবাদ করেন, আমরা তাঁহার কথায় বধিরকর্ণ হই। তাঁহার কথা শুনিলে পাছে আমরা আমাদের আবদ্ধ বুদ্ধির প্রতি আস্থাভ্রষ্ট হইয়া পড়ি, বহুকালের যত্নে অর্জ্জিত ধারণাকে ভ্রম মনে করি, এবং তাঁহার ধারণার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি, তজ্জন্য তাঁহার কথা ভাল কি মন্দ তাহার বিচার না করিয়াই তাহা ত্যাগ করিয়া থাকি। এই স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা অনেক কথা বলেন, যাহা বঙ্কিম গ্রন্থাবলীতে নাই। সুরেন্দ্রবাবুও তদ্রূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কি জানিতেন না যে, আমাদের মাথায় মাথায় বঙ্কিম কল্পনার ছাঁচা সকল ক্ষোদিত অক্ষরে বজায় আছে। আমরা তাঁহার উপদেশ গুলিকে গালাই করিয়া সেই ছাঁচায় ঢালাই করিতেই, সমস্ত আন্দোলনটা কেমন সুন্দর ভাবে আনন্দমঠে পরিণত হইয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে চটিলেন আমরা তাঁহাকে অপমান করিয়া দল হইতে তাড়াইয়া দিলাম।—যাঁহারা বলেন আমাদের সেরূপ করা অন্যায় হইয়াছে।—তার উত্তরে আমরা বলি—আমাদের বুদ্ধি কল্পনা ও ধারণা সকল যে কি ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহা না জানিয়া, যাঁহারা আমাদের নেতৃত্ব করিবেন, তিনি অপমানের পাত্র না হইবেন কেন?—ভারত-ভূমি, এ ভাবে গঠিত যে; বর্ষার সময় সমস্ত জল নদনদী বহিয়া, পরিশেষে ভারত সাগরে যাইয়া পড়ে। এ অবস্থায় যদি কোন বীরবক্তা বলেন যে, 'তোমরা বর্ষার জল ভারতসাগরে যাইতে না দিয়া, ভারতেই আবদ্ধ করিয়া রাখ।' এইরূপ বলিবার পর, বর্ষার জল কি ভারতসাগরে না গিয়া ভারতমধ্যে আবদ্ধ হইতে থাকিবে?—এরূপ খেয়াল যাহার মাথায় উদয় হয়, সে অপমানিত হইবার পাত্র নহে কিসে? তুমি যদি দেশের মাটি কাটিয়া উত্তর দিকে ঢালু করিয়া দিতে না পার, তবে কি বর্ষার জল তোমার কথা মানিয়া দক্ষিণগামী হইবে না। নেতারা যখন বঙ্কিম কল্পনার বিরুদ্ধবাদী নহে, তখন আমরা বঙ্কিম কল্পনার স্রোতে না ভাসিব কেন? সেই স্রোত যদি নেতাকেই ডুবাইয়া মারে, সে দোষ কার?—যদি এমনি ভাবিয়া থাক যে বঙ্কিম কল্পনা মাথায় মাথায় বজায় থাকিতে, কোন আন্দোলনেই সুফল ফলিবে না, তবে, নেতারা ঐ মাটি-কাটা কাজে, অর্থাৎ বঙ্কিমকল্পনার উচ্ছেদে হস্তক্ষেপ করেনা কেন? তোমরা নিজে বাতুলবুদ্ধি, অথচ আমাদিগকে বাতুল বলিতেছ।—আমরা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে দেখাইলাম যে, আমরা বঙ্কিমবুদ্ধি।'

মাটি না কাটিয়া, আবার বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে!—তোমরা কোন্ মুখে বল যে তোমরা অপমান হইবার পাত্র নও। তোমরা নিজের কাজ বোঝ না আমাদের কাজের ভুল ধর।—আমরা যে স্বার্থপর তাহা সত্য, আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত, আমরা একজনকে লুণ্ঠন করিয়া একজন লাভবান হইতেছি। তোমরা যে কতিপয় লোক, একত্র হইয়া একটা দেশব্যাপীডাকাতের দল বাঁধিয়া, দেশ হিতৈষণার ভাণে দেশ লুণ্ঠনে দাঁড়াইয়াছ? তোমরা কি আমাদের কল্পনায় শাণ দিতে দাঁড়াইয়াছ। আমাদের কল্পনায় শাণ দিলে, তোমাদের এই দেশ লুণ্ঠনকার্য্যে বাধা পড়িবে না কি? তোমরা কি কম ওস্তাদ!

৩ * নন্দের ফন্দী। * ৩

এই ইংরেজ আমলে যেমন এক শ্রেণীর হিন্দু ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া ইংরাজি হাবভাব ও চালচলনাদি গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন; অথচ হিন্দুয়ানী ভাব ও ধর্ম্মটিকে অন্তরের গভীর কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছেন; তেমনি মোসলেম শাসনকালেও এই শ্রেণীর লোকেরা ফার্সি ও আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া, ইঁহাদের দৃষ্টান্তে তাঁহারাও মোসলেম চালচলন ও আচারব্যবহারে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারাও তাঁহাদের অন্তরের গভীর কোণে হিন্দুধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ দ্বিতরী-চরণধারী মনুষ্যকে আরবী ভাষায় 'মোনাফেক' বলে। মোনাফেকরা কখনই বিশ্বাসী হয় না। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে, জিজিয়া আদি কতিপয় রাজকর লইয়া, সে কালের মোনাফেকরাই, সর্ব্বপ্রথম রাজদ্রোহিতার সূত্রধারণ করে। সেই প্রাচ্য দ্রোহির দল যদিও মাঝে মাঝে লোপ পাইয়াছিল-কিন্তু তাহা, একালের স্বদেশী হাঙ্গামাবৎ এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই দেশবিপ্লবী-দুষ্ট স্রোতস্বতী দিল্লী হইতে বিনির্গত হইয়া বঙ্গদেশে আসে, এবং এ দেশের মাটির (অর্থাৎ দুষিত বুদ্ধির) দোষে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। সিরাজুদ্দৌলার শাসনকালে, বিলাতী-বণিক-রূপ প্রবল বর্ষাবারিতে-পুষ্টিলাভ করিয়া, সেই স্রোতস্বতী বঙ্গদেশকে এককালে ভাসাইয়া দেয়। এই দুষ্টদ্রোহি বা মোনাফেকদের সহিত অন্য কোন হিন্দুই (কি সেকালে কি একালে) কখনই যোগদান করেন নাই।

সেই দ্রোহিতার ফলে মোসলেম রাজ্য উড়িয়া যায়। মদিনার মোনাফেকদের

পারিলে, বিদেশী বণিককে তিন তাড়ায় দেশছাড়া করাইয়া, বঙ্গরাজ্যকে হিন্দুরাজ্য করিয়া লইবে। কিন্তু রাজবুদ্ধি ও গোলামবুদ্ধি, এই দুই বুদ্ধির মধ্যে যে কত প্রভেদ, মোনাফেকরা তাহা তখনও বুঝিতে পারে নাই, এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। কাজেই রাজবুদ্ধি বিহীন মোনাফেকগণ যাহা ভাবিল, কার্য্যাবসানে তাহার বিপরীত ঘটিল। রাজবুদ্ধিই রাজ্য পাইয়া গেল। রাজবুদ্ধি তখন এই দাসবুদ্ধি মোনাফেকদিগকে প্রকৃত, রাজদ্রোহী ও দেশদ্রোহী স্থির করিয়া, এতদূর ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা ইহাদিগকে, নবার্জ্জিত রাজ-সরকারে কোন একটি চাকরী দিয়াও ইহাদের সেই ঋণ পরিশোধ করিলেন না। মোনাফেকরা তখন নগদা মুটেগিরীতে এস্তেফা দিয়া, গভীর গোপনে হিন্দু সেনার রচনায় মনোযোগী হইল।

এই গুপ্ত সেনা-রচনার ভার, ইতিহাস প্রসিদ্ধ নন্দকুমার ঠাকুর গ্রহণ করিলেন। তিনি যে এই মহৎকার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্তব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না; তবে কি না, যাঁহারা ধর্ম্মেরভাণে ও কুটকৌশলাদির অবলম্বনে, এইরূপ পবিত্র-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা কখনই সফলকাম হইতে পারেন না, ইনিও পারিলেন না। দাসবুদ্ধি মোনাফেকরা ভাবিয়াছিল যে, তাহারা কাকের ঝাঁকে লাকে লাকে একত্র হইয়া, বণিকদিগকে অবিরাম ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকিলে, বণিকেরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু তাহাতে গোলামবুদ্ধিগত ফলই ফলিল।

এই নন্দকুমারকে কল্পনায় স্থান দিয়া, নভেল ঠাকুর এই আনন্দমঠ গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে ঐ সময়ের চিত্র সকল প্রকটিত করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে নন্দকুমারের নামটি গোপন করিলেও, ঠাকুর তাঁহার চিত্রখানি আমাদিগকে মাঝে মাঝে দেখাইয়াছেন এবং তখন তাঁহাকে বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই বৈকুণ্ঠনাথ মহাশয়, যে সকল ধর্ম্মের ভাণ ও কূট কৌশল অবলম্বন করিয়া, যে যে কৌশলে এই গ্রন্থগত দস্যুসেনার সঞ্চয় করিয়াছিলেন,—তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে খুলিয়া দেখাইব। সত্যানন্দ যে কেমন করিয়া কোথা হইতে দস্যুসেনার সেনাপতি হইয়া অনন্ত নিবিড় নির্জ্জন বনমধ্যে আনন্দমঠ খুলিয়া বসিয়াছিলেন, সেই গোড়ার কথাগুলি নভেল ঠাকুর ত্যাগ করিলেও আমরা প্রকাশ করিব। এই গোড়ার কথাগুলি ত্যাগ করায় তাঁহার পুস্তকে যে সকল অসামঞ্জস্য দেখাদিয়াছে, তখন এই অসামঞ্জস্য আর থাকিবে না।

নন্দকুমার ঠাকুর বঙ্গদেশের জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিয়া, গুরুমহাশয়দিগকে স্বীয় মতাবলম্বী করিয়া লইয়া, ছাত্রবৃন্দকে স্বকীয় করিতে

৪ ❋ বঙ্গবালাই বঙ্গমাতা। ❋ ৪

সত্যানন্দ নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেকদিন ধরিয়া, ইতিহাস বিখ্যাত নন্দকুমারের সন্তান গুরুদাসকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। সত্যানন্দের পত্নী একটি কন্যা প্রসব করিয়া সহসা মৃতমুখে পতিতা হন। সেই সংবাদ পাইয়া, সত্যানন্দ চাকরী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং তথায় এক টোল খুলিয়া অধ্যাপকের কার্য্য করিতে থাকেন। সত্যানন্দের তিনকুলে কেহই ছিল না। পরন্তু কন্যাটীর প্রতিপালনের ভার তাঁহাকেই বহন করিতে হইয়াছিল।

অগত্যা তিনি, তাঁহার কন্যা শান্তিমণিকে সঙ্গে লইয়া, এক ভদ্রলোকপূর্ণ সুন্দর গ্রামে যাইয়া; তথাকার এক মনোহর স্থলে, গ্রামের কেন্দ্রদেশে প্রশস্ত পথের উপর, এক খানি চিত্তবিনোদন আটচালা নির্ম্মাণ করিলেন। প্রথম চারিচালের অন্তর্গত একখানি ১০ × ৬ হাত পরিমাণ মেঝে বিশিষ্ট সুন্দর কক্ষ। সেই কক্ষের চারিদিকে চারি যোড়া কপাট, প্রতি কপাটের প্রতি পার্শ্বে অত্যুচ্চস্থিত বাতায়ন। ঐ চালের চারিদিকে চারিখানি পরচাল বা উপচাল ফেলিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে তিন হাত প্রশস্ত দাওয়া বা বারেন্দা নির্ম্মিত হইল। ইংরেজ-বাঙ্গালার ন্যায় গৃহখানি অতি মনোহর হইয়াছিল। কথিত আছে এই পাঠশালার ব্যয়ভার নন্দকুমার ঠাকুর বহন করিয়াছিলেন। পাঠশালার চতুষ্পার্শ্ব, পুষ্পতরু পরিশোভিত হইয়াছিল। সত্যানন্দের ছাত্রবৃন্দ ঐ বারেন্দায় বসিত। তিনি এই আবাসেই শান্তিকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সত্যানন্দের শিক্ষাপ্রণালী অতিশয় সুন্দর; তাঁহার যাদুকরী কথায় সকলেই মুগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িতেন। দেখিতে দেখিতে বালক বালিকায়, তাঁহার ছাত্রসংখ্যা তিনশত হইয়া পড়িল। অকৃতজ্ঞ ইংরেজদিগকে কি কৌশলে দেশ হইতে তাড়ান যাইতে পারে, সেই চিন্তা মাথায় লইয়া, একদিন নন্দকুমার বাবু সত্যানন্দের পাঠশালা দর্শন করিতে আসিলেন।

সত্যানন্দবাবু, তাঁহাকে অপরিসীম সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। এবং ছাত্রদলকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বিবিধ প্রকার প্রশ্ন করিয়া, স্বীয় শিক্ষা প্রণালীর মহিমা দেখাইয়া, তাঁহার ও গ্রামবাসীদের নিকট মহা যশস্বী হইলেন। নন্দকুমারবাবু আনন্দিত হইয়া গুরুমহাশয়কে ২০০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন এবং

ভবানন্দ, ধীরানন্দ এবং জ্ঞানানন্দ, এই চারিজনকে ১০৲ করিয়া পুরস্কার করিলেন। বালিকাদের মধ্যে বঙ্গবালা এবং কল্যাণী ১০৲ হিসাবে পাইলেন। অবশিষ্ট সকলে ৫৲, ২৲, ১৲ এবং ॥০ হিসাবে পাইলেন।—নন্দকুমার ঠাকুর প্রথম ছয়টি ছাত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে তিনি রূপবতী বঙ্গবালার শোভাসৌন্দর্য্য ও দেবীসদৃশ মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া, মনে মনে এক অপরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিলেন—'আমার কথা সকলেই বিশ্বাস করে, অতএব আমি যদি এই মূর্ত্তিমতী বালিকারত্নকে দেবী বলিয়া উল্লেখ করি, এবং ইহা-দ্বারা কতকগুলি কৌশলসম্পন্ন অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে, সকল বাঙ্গালীই ইহাকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মান্য করিয়া লইবেন।—এই সূত্রে আমি একটা দল গঠন করিয়া লইতে পারিব, এবং সেই শক্তি দ্বারা ইংরেজশক্তিকে নিশ্চয়ই পরাভূত ও বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইব।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বঙ্গবালাকে এক হরিত তৃণাসনে দাঁড়াইতে বলিলেন। চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া বঙ্গবালা, যখন তাঁহার সেই স্ফুটোন্মুখ যৌবন ও বিস্ফারিত নীলনয়নের উপর তুলিবিতুলিত ভ্রূদ্বয়সহ, বদনেন্দুপ্রভাসিত লজ্জা ও তদুপরি আগুল্ফলম্বী কুঞ্চিত চিকুরদাম পরিশোভিত জ্যোতির্ম্ময় মুখখানি লইয়া, বনদেবীসদৃশী নবীন তৃণাসনে দণ্ডায়মানা হইলেন, তখন নন্দকুমার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন;—"মা, আমরা তোমাকে কেহই চিনিতে পারি নাই। তুমি আমাদের সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, জননী জন্মভূমি! আমরা অতি ভ্রান্তমতি, তোমার সেবা করিতে পারি নাই, তাই মা তুমি সশরীরে আবির্ভূতা হইয়াছ। তোমার এই দুর্ম্মতি সন্তানকে শ্রীচরণে স্থান দান কর!" এই বলিয়া ভক্তিসহকারে বঙ্গবালার পদমূলে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া প্রণাম করিলেন।—বঙ্গবালা বিস্ময়বিভোর নেত্রপাতে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলেন।

নন্দকুমারবাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, গুরুমহাশয়, তৎক্ষণাৎ ছাত্র ও ছাত্রী সকলকে লইয়া বঙ্গবালাকে নমস্কার করিলেন। বঙ্গবালা আবার অবাক নয়নে চতুর্দ্দিক চাহিলেন। দর্শকগণ তাঁহার চাহনীতে ভীত হইয়া অবিলম্বে বন্দেমাতরম বলিয়া দণ্ডবৎ হইলেন। নন্দকুমারবাবু, সেই দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ এক অভিনব ভাব উদ্ভব করাইয়া দিয়া, এবং গুরুমহাশয়কে গোপনে অনেক গুপ্ত কথার পরামর্শ দিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নন্দকুমারের প্রস্থান করিবার পর, সমগ্র গ্রামে এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

নয়নে ও আস্থাপূর্ণ অন্তরে দেখিতে লাগিলেন। অদ্যাবধি গুরুমহাশয় তাঁহাকে স্বীয় কক্ষের মধ্যে বসাইয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। যখন তিনি কোথাও যাইতেন, বঙ্গবালাকে জীবানন্দের রক্ষণাবেক্ষণায় রাখিয়া যাইতেন, জীবানন্দকে সকলে 'ছোট মহাশয়' বলিত।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর, বঙ্গবালা, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ এবং জ্ঞানানন্দ, এই পঞ্চছাত্রকে, গুরুমহাশয় আপনার নিকট বসাইয়া বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন। রাজনৈতিক বিষয়ে, দেশ প্রথা সম্বন্ধে, হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজদের জাতিগত হাবভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার, জ্ঞান-গুণাদির পার্থক্য দেখাইয়া শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। হিন্দুরা প্রাচীনকালে কিরূপ মহাপুরুষ ছিলেন, কিরূপে ম্লেচ্ছ যবনেরা, তাহাদের সুজলা-সুফলা-সস্যশ্যামলা বঙ্গমাতাকে বাহুবলে অপহরণ করিয়া ৫৭০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতেছে,—কিরূপে তাঁহার জাতিকুল ও ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া কলঙ্কিনী করিয়া রাখিয়াছে,—কিরূপে সম্প্রতি হিন্দুরা, সেই পাপাত্মা সকলকে নিধন করিতে দাঁড়াইয়াছে,—কিরূপে ইংরেজ বণিকদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া পলাশি ক্ষেত্রে সিরাজুদ্দৌলাকে বধ করিয়াছে, এবং তাঁহার সেনাপতি মির জাফরকে সিংহাসনে বসাইয়াছে,—কিরূপে মির জাফরকে তাড়াইয়া তাঁহার আসনে মির কাসেমকে বসাইয়াছে,—কিরূপে মির কাসেমকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, পুনর্ব্বার মির জাফরকে রাজ্যভার প্রদান করা হইয়াছে,—এইরূপে ঘনঘন হস্ত পরিবর্ত্তন করাইয়া, বীর যবনদের ক্ষমতা এতদূর হ্রাস করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এখন নবাব মির জাফর, রাজ্যশাসন করিতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়ায়, ইংরাজ বণিকেরা, রাজকরের আদায়-ভার তাহাদের নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাতে তাহারা, যেরূপে এই দুর্ব্বল দেশবাসিদের রক্ত-শোষণ করিতেছে, তাহা মনে করিলেও প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়। হায়, হায়! আমাদের জননী-জন্মভূমি, ম্লেচ্ছ জাতির হস্তে পড়িয়া, এইরূপে তাহাদের বাঁদীপনা করিতে থাকিলেও, আমরা তাঁহার এমন বাঁদীবাচ্চা-রূপ সন্তান যে, মায়ের উদ্ধারের কোনই চেষ্টা করিতেছি না।—সেই জন্য আমাদের মাতা সশরীরে ধরায় অবতীর্ণা।

বঙ্গবালা এইরূপ শুনিতে শুনিতে, আপনাকে জননী-জন্মভূমি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেন। এবং যবনেরা তাঁহাকে কলঙ্কিনী করিয়াছে শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। গুরুমহাশয় তাহাতে ছাত্রবৃন্দকে বলিলেন। "তোমাদের মাতাকে

আমাদের বর্ষার জল। ঐ জল অপচয় হইতে দিও না।" অমনি সকলে 'বন্দে মাতরম' বলিয়া বঙ্গবালার শ্রীচরণে অবলুণ্ঠিত হইল।

তখন সত্যানন্দ ঠাকুর সাহিত্যসাগর মথিত করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন। "এমন সুবর্ণ-সুযোগ পাইয়াও যদি হিন্দুসন্তানেরা মায়ের উদ্ধার করিতে না পারে, তবে নিশ্চয়ই এবার মাতাকে বিদেশী ইংরেজদিগের ক্রোড়গত হইতে হইবে। তখন এ দেশের দশা কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা শোন—' পিশাচ প্রসব যত করিবে এ নারী, এ স্বামী নূতন স্বামী বিলাতী সঙ্গমে।'—(যমজ ভগিনী দেখ)।—এখনও মায়ের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর,—আত্মোৎসর্গ কর—ভক্তি দেখাও,—ভক্তি দেখাও।—সন্তান হইয়া জননীকে ম্লেচ্ছ জাতির সহিত একত্র হইতে চক্ষে দেখিও না, দেখিও না।—যদি সন্তান হও তবে, তেমন চক্ষে জ্বলন্ত লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দাও।—ঐ দেখ, জননী কিরূপে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন!—ভক্তি দেখাও, ভক্তি কর, বল 'বন্দে মাতরম।'

এইরূপে নিয়ত, সন্ধ্যাকালে গুরুমহাশয় যাহা যাহা শিক্ষা দিতেন, দিনমানে জীবানন্দ তাহা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া অবশিষ্ট ছাত্রবৃন্দকে শোনাইতেন। এইরূপে কতক দিনের মধ্যেই গুরুমহাশয় এবং তাঁহার প্রধান ছয়জন ছাত্র ও ছাত্রী, এই সাতজন, এক সুতায় গ্রথিত টোলের সপ্তরত্নবৎ হইয়া দাঁড়াইলেন। একদিন কয়েক জন মুটে একখানি, দুইজন শয়ন করিবার মত সুন্দর তক্তা, মাথায় করিয়া আসিয়া গুরুমহাশয়ের গৃহ সাজাইয়া দিয়া গেল। ষষ্ঠপদ বিশিষ্ট মনোহর তক্তাখানি প্রায় দুইহাত উচ্চ হইবে। এবং তাহা যে, কৃতকর্ম্মা শিল্পী-সম্ভূত-শয্যা, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। গুরুমহাশয় এবার হইতে ছাত্রদলকে লইয়া, সেই তক্তায় বসিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। (এই তক্তায় যাদুকরী গুণরাশি গুরুমহাশয় আগে হইতেই জানিতেন, পাঠকেরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন। ইহা নন্দকুমার ঠাকুরের ভৌতিক তক্তা।) একদিন গুরুমহাশয় সকল ছাত্রকে বনফুল তুলিয়া, একৈক জনকেএকছড়া করিয়া মালা গাঁথিতে বলিলেন। এবং পাঁচ ছড়া অতিরিক্ত হার বঙ্গবালার জন্য গাঁথিবার আদেশ করিলেন। তাহারা পলকের মধ্যে গুরুআদেশ পালন করিয়া মালাহস্তে গুরু সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। গুরুমহাশয় বালকগণকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড় করাইলেন। এবং বালিকাগণকে আপনার নিকট ডাকিয়া একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।" "কল্যাণি, তুমি এতগুলি বালকদের মধ্যে কাহাকে

কল্যাণী বলিলেন। "আমি ভবানন্দকে ভালবাসি।" গুরুমহাশয় তখন ভবানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "তুমি কল্যাণীকে ভালবাস কি?" ভবানন্দ বলিলেন। "প্রাণের অধিক।" গুরুমহাশয় আদেশ করিলেন। "তবে তোমরা মালা বিনিময় কর।" অমনি কল্যাণী ভবানন্দের এবং ভবানন্দ কল্যাণীর গলে মালা অর্পণ করিলেন। এবং তাঁহারা যুগলমূর্ত্তি হইয়া গুরুমহাশয়ের আদেশ মতে এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন।

গুরুমহাশয় এইরূপে সকল বালকবালিকাদের মধ্যে জোড়া মিলাইয়া দিয়া, অবশেষে বঙ্গবালার করে সেই অতিরিক্ত পাঁচ ছড়া মালা দিয়া কহিলেন। "তুমি দেবী হইলেও, এখন মানবী। সেহেতু ধরাধামে তোমারও স্বামী হওয়া উচিত। কিন্তু তুমি যত ইচ্ছা তত স্বামী করিতে পার। তাই তোমাকে পাঁচ ছড়া মালা দিলাম। তোমার যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা মালা পরাও।"

বঙ্গবালা প্রথমে গুরুমহাশয়ের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন। তারপর জীবানন্দের গলায় এক ছড়া দিলেন। অমনি গুরুমহাশয়ের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা শান্তিমণি, চঞ্চলচিত্ত হইয়া, বঙ্গবালার হাত হইতে অবশিষ্ট তিন ছড়া মালা কাড়িয়া লইল, এবং এক ছড়া আপনি পরিল, এক ছড়া জীবানন্দকে পরাইল, আর একছড়া ধীরানন্দের গলে দিয়া বলিল,—"আমি এদের ভালবাসি।" শান্তির বালিকাবুদ্ধিগত কার্য্যকলাপে তথায় এক হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

গুরুমহাশয় জীবানন্দকে বলিলেন। "তুমি শান্তিকে লইয়া যাও, আমি এ কন্যাকে তোমায় দান করিলাম।" শান্তি বলিল। "ধীরানন্দকে ফেলিয়া একা জীবার সঙ্গে যাব কেন?" গুরুমহাশয় বলিলেন। তবে কি তুই দ্বিচারিণী হইবি? শান্তিমণি।—"হইলাম তায় দোষ কি?" অমনি আবার তথায় হাসি পড়িয়া গেল।

গুরুমহাশয় শান্তিকে আর কোন কথা না বলিয়া, ছাত্র সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "তোমরা অদ্যাবধি টোলের যুগলমূর্ত্তি হইলে। তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত সঙ্গে করিয়া পাঠশালায় আসিবে; ছুটি পাইলে আবার সঙ্গে করিয়া যাহার যে বাড়ী পৌঁছিয়া দিবে। তোমরা পাঠশালায় একত্র বসিবে, পথে একত্র চলিবে, পরস্পরে সদ্ভাব দেখাইবে, কদাচ ঝগড়া করিবে না।" এইরূপ যোড়া মিলাইয়া দিবার পর, ছাত্রবৃন্দ-মধ্যে এক অচিন্তনীয় স্বর্গীয় সদ্ভাব আবির্ভূত হইল, এবং বালকবালিকাদের মধ্যে এক অনির্ব্বাচনীয় শান্তির উদ্ভব হইল; পথেঘাটে

ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকেরা গুরুমহাশয়ের উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন।

রূপবতী বঙ্গবালার বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর। তাঁহার পিতার নাম রঙ্গপতি ঠাকুর। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার নবীনা-কন্যা, গুরুমহাশয় এবং জীবানন্দ, এই দুইজনকে বরমাল্য পরাইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল। বঙ্গবালা পাঠশালা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই, তাঁহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বঙ্গবালা গোপন না করিয়া সকল কথা অবিকল বলিয়া, প্রশ্ন করিলেন। "তাতে কি হইয়াছে?—আপনারই বা রাগ হইতেছে কেন?"

রঙ্গপতি সবিস্ময়ে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন। "আমি তোমার পিতা, আমি তোমার অভিভাবক, আমার উজ্জ্বল-কুলে কালি দিয়াছ, আমার তায় রাগ হইবে না?" বঙ্গবালা স্বাধীনভাবে উত্তর করিলেন। "আপনি আমার পিতা নহেন!—মনে করিবেন না যে, আমি আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।—আমি এমন স্বর্গীয় ঔরসজাতা যে, মরিলে আমার শবদেহ অগ্নিতে পুড়িবে না, গোরেও পচিবে না। আপনি আমার কোন কথায় কথা কহিবেন না।—আমি আপনার বাড়ীতে স্বল্পদিন মাত্র আছি।" এই বলিয়া দেবমূর্ত্তিবৎ বঙ্গবালা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঙ্গপতি সেই অচলা অটলা প্রতিমূর্ত্তির পানে স্থির অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। যত কিছু বলিবেন এবং যতরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। আর তাঁহার মুখে বাক্য সরিল না।

চামুণ্ডা-রূপিনী বঙ্গবালা, দুই এক বার গম্ভীর ভাবে নয়ন বিকীর্ণ করিয়া, ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। রঙ্গপতি ভাবিলেন, বঙ্গবালা নয়নের পলকে অদৃশ্যা হইয়া গেল। পাঠশালায় যাইতে নিষেধ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল না।

সত্যানন্দের এই পাঠশালার দৃষ্টান্তে, নন্দকুমার ঠাকুর বাঙ্গালার বহুস্থলে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ সকল পাঠশালার তত্ত্বাবধানের জন্য অনেক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল লোক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সকল পাঠশালায় পরিভ্রমণ করিয়া, সংবাদ ও সাহায্যের আদান প্রদান করিত। নন্দকুমারের অভিসন্ধি এই যে, একদিন ঐ সকল পাঠশালাকে, কোন এক মহাবনে একত্র করিবেন এবং সত্যানন্দকে তাহার নেতা বা সেনাপতি করিয়া ইংরাজদের

৫ ❋ রক্তপান। ❋ ৫

পরদিবস প্রভাতে ছাত্রসকল, যেমন নিয়ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আসে, তেমনই আসিয়া চতুর্দ্দিকের দাওয়া পরিশোভিত করিয়া বসিতে লাগিল। অনেক বেলা হইল তথাপি গুরুমহাশয় জাগিলেন না, দ্বার খুলিলেন না। ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ গুরুমহাশয়কে জাগাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি ঘনঘন কোলাহল করিয়াও ফল দর্শিল না। দ্বারে বারংবার আঘাত করিয়াও কেহ গুরুমহাশয়কে তুলিতে পারিল না। বালকেরা জীবানন্দকে বলিল। "হয় তো গুরুমহাশয় কোনস্থানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছেন; তুমি আমাদের ছুটি দাও, আমরা বাড়ী যাই।" জীবানন্দ বলিলেন। "ঘরের ভিতর হইতে খিল দেওয়া, গুরুমহাশয় ভিতরেই আছেন।—আজ বঙ্গবালা আসিলেন না কেন?" একজন বলিল। "তাঁর পিতা তাঁকে নিষেধ করিয়াছেন। সে আর পড়িবে না।"

জীবানন্দ দেখিলেন সকল দ্বারই ভিতর হইতে বন্ধ। দক্ষিণ, পূর্ব্ব এবং উত্তর এই তিন দিকের তিনটি মাত্র বাতায়ন খোলা আছে; কিন্তু বাতায়ন সকল মনুষ্য-দৃষ্টির উচ্চে সংস্থাপিত বলিয়া, জীবানন্দ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে একটি এক-ছিয়া মই চাহিয়া আনিলেন। সেই মই উত্তর দিকের খোলা জানালায় বসাইয়া, সোপানে আরোহণ করিয়া, যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি চীৎকার না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। "সর্ব্বনাশ হইয়াছে! গুরুহত্যা, গুরুহত্যা হইয়াছে।"

"সে কি,—সে কি,—এঁ্যা—সে কি কথা!" বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ঘোর আর্ত্তনাদ ও কোলাহল আরম্ভ হইল। ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন, সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এবং মইয়ে চড়িয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য সোপানের চতুর্দ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবানন্দ বলিলেন। "বঙ্গবালা, গুরুমহাশয়ের মস্তক ছেদন করিয়া, তক্তায় বসিয়া আনন্দে শোণিত পান করিতেছে। গুরুমহাশয়ের অবশিষ্ট শরীর তক্তাতলে পড়িয়া ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে।—এই তোরা মইয়ে চড়িয়া দেখ। ব্যাপার অত্যন্ত ভীষণ!"

এই বলিয়া জীবানন্দ মই হইতে নীচে নামিলেন। তখন ধীরানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ এবং আর আর ছাত্রবৃন্দ, একে একে সোপানে আরোহণ করিয়া সবিস্ময়ে

চড়িয়া দেখিলেন। কিন্তু সকলের দেখা সমাপ্ত হইল না, বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে শ্রুতিমধুর গান, শ্রুতিগোচর হইল। সেই গানে সত্যানন্দ এবং বঙ্গবালা উভয়েরই কণ্ঠস্বর সপ্তম স্বরে উঠিতে ও নামিতে লাগিল।—

গান।

তোরা কি চিন্‌বি মায়ে তোরাই মায়ের যম।
তোরা কি বলবি বন্দে মাতরম্‌!
মায়ের লজ্জা ঢাকবি কবে, তোদের ভাল চামার ড্রোম।

যাঁহারা এই অপরূপ লীলা দর্শন করিতে পান নাই, তাঁহারা দেখিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। এবং দক্ষিণের বাতায়ণ দিয়া দেখিবার জন্য, মই কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। একটা হুলস্থুল গোল বাধিয়া গেল। শেষে জীবানন্দ এই বলিয়া গোল নিবাইয়া দিলেন। "যিনি প্রথম আসিয়াছেন, তিনি প্রথম দেখিবেন।" কথাটি সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

পরন্তু তাঁহারা দক্ষিণ দিকের গবাক্ষে যাইয়া, উপদেশ মত একে একে সোপানে আরোহণ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা সবিস্ময়ে দ্বন্দ্বমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, —'তোমরা মিথ্যাবাদী! গুরুমহাশয় এবং বঙ্গবালা, উভয়ে শূন্যে দাঁড়াইয়া অতি কৌশলসম্পন্ন মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। আর আবাসের মধ্যে তক্তা প্রভৃতি কিছুই নাই।" এই নূতনকথা শুনিয়া আবার সকলে নবোদ্যমে সেই অভিনব অভিনয় দেখিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। সকলের দেখা হইল না, সে বাতায়নও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা পূর্ব্বদিকের বাতায়ন দিয়া দেখিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

পূর্ব্বদিকের বাতায়নে সোপান ফেলিয়া, তাহাতে আরোহণ করিয়া একে একে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। 'বঙ্গবালাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সত্যানন্দ, সেই তক্তার উপর, চেতনহীন পদার্থের ন্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ, একখানি গিহী-উত্তরীয় দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। বঙ্গবালার জ্বলন্ত রূপরাশী ও অবয়ব-সমূহ, বস্ত্র ভেদ করিয়া, এক অপরূপ শোভায়, বিকাশ পাইতেছে।' জীবানন্দ একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন।—'নন্দের ফন্দীতে প্রবেশ করা বাঙ্গালীর কাজ নয়।'

এই শেষ লীলা, গ্রামের সকলেই দেখিলেন, বাতায়ন আর বন্ধ হইল না।

কেহ লম্প-টলীলা মনে করিয়া ধিক্কার দিতেও ছাড়িলেন না।— এমন সময় রঙ্গপতি ঠাকুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অসহ্য-জনক দৃশ্যাবলী দেখিয়া একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেলেন। পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও প্রবিষ্ট হইলেন। অনেক চীৎকার, কোলাহল ও ডাঁকাডাকি করিলেন, কিন্তু যুগলমূর্ত্তি কিছুতেই জাগিলেন না। রঙ্গপতি সাহস করিয়া দ্বার ভাঙ্গিলেন সত্য, কিন্তু ভরসা করিয়া দম্পতি-মূর্ত্তির অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিলেন না। সকলেই তক্তার পার্শ্বে প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জীবানন্দ বাহিরে ছিলেন, তিনি ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন। "তোমরা মহা পাতকী! দেবতা-দেবীর বাসরাবাসে কাহার অনুমতিতে প্রবেশ করিলে?" রঙ্গপতি বলিলেন। "আমার কন্যা, আমার দেখিবার অধিকার আছে।—তুমি আসিলে কেন?" জীবানন্দ বলিলেন। "বঙ্গবালা তোমার কন্যা নহে।—বঙ্গবালা, আমার এবং গুরুমহাশয়ের স্ত্রী।—আমি উহাকে এবং গুরু-মহাশয়কে সকল অবস্থায় দেখিতে পারি।"—রঙ্গপতির মনে পড়িল, গতরাত্রে বঙ্গবালাও ঐরূপ বলিয়াছিল। তাঁহার অন্তরেও একপ্রকার দেব-জনিত ভয়ের উদয় হইল। তিনি সামান্য সরিয়া দাঁড়াইলেন। জীবানন্দ বঙ্গবালার অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অঙ্গস্পর্শ করিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন।— "হায়, সর্ব্বনাশ! তোমাদের পাপনয়নের দৃষ্টিপাত, দম্পতিমূর্ত্তির কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। দেখ দেখ, এ কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছ!—আমার অনুমতি, তোমরা অঙ্গস্পর্শ করিয়া দেখ!"

রঙ্গপতি এবং গ্রামের ভদ্রলোকগণ, যুগলমূর্ত্তির অঙ্গস্পর্শ করিলেন।—স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া গেলেন,—দম্পতিমূর্ত্তির সর্ব্বশরীর প্রস্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। "একি প্রস্তর যে!" বলিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। জীবানন্দ সামান্য উর্দ্ধমুখ হইয়া বলিলেন। "আপনারা যান!—আমরা পাঠশালার ছাত্রগণ, পাষাণশবদ্বয়ের যথাবিধি সৎকার করিব।" রঙ্গপতি সজল নয়নে জীবানন্দকে প্রশ্ন করিলেন। "বঙ্গবালা আমাকে বলিয়াছিল। 'আমি মরিলে আগুনে পুড়িব না, গোরেও পচিব না।' তবে তোমরা কিরূপে পাষাণমূর্ত্তির সৎকার করিবে?"

জীবানন্দ বলিলেন। "আমরা তাহা জানি না। যদি উঁহারা দেবতা হন, তবে দেবতারা আসিয়া উঁহাদের সৎকার করিবেন।" এই বলিয়া, দর্শকদিগকে কক্ষ

বাহিরে আসিলেন। সম্মুখের দ্বারে তালালগ্ন করিয়া, ছাত্রসকলকে বৈকালে আসিবার আদেশ দিয়া, তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সজলনয়না শান্তিও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন।—সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। 'শান্তি এতক্ষণ কোথায় ছিল।' কেহ বলিল। 'দেব-লীলা কে বুঝিবে।' কেহ বলিল 'সকলই অবাক কাণ্ড, বাজির খেলা।' কেহ বা ভক্তিভাবে 'বন্দে মাতরম' বলিয়া, শেষে যাহার যে আবাসে চলিয়া গেল।

৬ ❋ আশ্চার্য্য সৎকার। ❋ ৬

জীবানন্দ শান্তিমণিকে তাঁহার আবাসে রাখিয়া, অপরাহ্নে আবার পাঠশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, তথায় অন্ততঃ পঞ্চসহস্র ছাত্র সমবেত হইয়া, পাঠশালার মাঠ উজ্জ্বল করিয়া দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া আছেন। জীবানন্দ তাঁহাদের কাহাকেই চিনিতে পারিলেন না।—তাঁহাদের নেতার নাম মহেন্দ্রসিংহ। জীবানন্দ আসিলে, মহেন্দ্র সকল ছাত্রকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া, জীবানন্দকে প্রণাম করিতে বলিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। জীবানন্দ মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আপনারা কোথা হইতে কি উদ্দেশে এখানে আসিয়াছেন?"

মহেন্দ্রসিংহ উত্তর করিলেন। "আমরা উত্তর-বাঙ্গালার বিবিধ টোলের ছাত্র সকল। আমাদের জননী জন্মভূমি, এবং গুরুদেব সত্যানন্দ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে; এ কথা আমাদের, অধ্যাপক মহাশয়কে স্বপ্ন হইয়াছিল। আমার বাড়ী পদচিহ্ন গ্রামে, অদ্য প্রভাতে এই ছাত্র-সমূহ আমাদের টোলে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের অধ্যাপকের আদেশে, আমি সকলকে সঙ্গে করিয়া, এই সৎক্রিয়ায় যোগদান করিতে আসিয়াছি। অনেক ছাত্রের নিবাস এখান হইতে ৫। ৭ দিনের পথ, তাহারা কি প্রকারে নিমিষের মধ্যে সেখান হইতে আসিল, তাহা আমি জানি না।"

এইরূপ শুনিয়া জীবানন্দ দূরবর্ত্তী বালক সকলকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল। "অদ্য প্রভাতে, আমাদের প্রত্যেক পাঠশালায় একজন করিয়া সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের নয়ন বস্ত্র দ্বারা বন্ধ করিয়া, কতক্ষণ পর খুলিয়া দেন। আমরা নয়ন খুলিয়া দেখি পদচিহ্নের টোলে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি।" এইরূপ শুনিয়া গ্রামের লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া, জীবানন্দের নিকট আসিয়া নিবেদন

আমরাও সৎক্রিয়ায় যোগদান করি।" জীবানন্দ বলিলেন। "সৎকার্য্যে যোগদান করিতে, কাহাকেও নিষেধ করিতে পারি না।"

বেলার বিলীনকালে, ছাত্রসকল ও গ্রামবাসিগণ একমনপ্রাণে মিলিত হইয়া, প্রস্তর শবদ্বয়কে তক্তাসহ স্কন্ধে লইয়া জীবানন্দের আদেশমত গ্রাম হইতে বহির্গত হইলেন। মাঠে পড়িতেই অন্ধকার হইয়া গেল। সঙ্গে কোন প্রকার আলো ছিল না, পথচলা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িল। সহসা কোথা হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। কতক সন্ন্যাসী মাঠের মধ্যস্থলে এক আকাশস্পর্শী বিটপীতলে, আলো জ্বালাইয়া চীৎকার করিতেছেন—"জীবানন্দ এই দিকে আইস!—মহাপ্রভুদ্বয়ের সৎকার এইখানে হইবে। এইখানে চিতা সাজান হইয়াছে।" জীবানন্দ তাঁহাদের স্বর ধরিয়া সেইখানে গমন করিলেন।

যাত্রিবর্গ বিটপীতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যসত্যই বৃক্ষতলে এক সুন্দর চিতা সাজান রহিয়াছে। তাঁহারা সেই চিতার উপর শবদ্বয়কে শয়ন করাইতেই, সেই জনতার মধ্যে আবার এক বিস্ময়জনক কার্য্য সংঘটিত হইল। সমগ্র চিতা শবদ্বয়কে লইয়া উর্দ্ধগামী হইয়া শাখার উপর অরোহণ করিল; এবং অবিলম্বে শাখা হইতে এক স্বর্ণবেদী নিম্নদেশে অবতরিত হইল। সেই বেদীর উপর, স্বর্গীয় ভূষণে পরিভূষিতা হইয়া, সত্যানন্দের পার্শ্বে বঙ্গবালা, জলন্তরূপের প্রতিভা প্রকাশ করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং সমস্বরে গাহিতে গাহিতে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন।—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!— গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।"

তাঁহাদের সঙ্গে সন্ন্যাসিগণও ঐ গান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীদের দেখা-দেখি ছাত্রবৃন্দ এবং গ্রামবাসীরাও 'হরে মুরারে' গাহিলেন।—দেবীদর্শনে দর্শকসকল একেবারে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, কি বলিয়া ভক্তি দেখাইবেন, কি করিলে জননী পরিতুষ্টা হইবেন, তাহার কোন স্থিরতা করিতে পারিলেন না। ছাত্রগণ 'বন্দেমাতরম' বলিয়া যুগলমূর্ত্তির পাদপদ্মে দণ্ডবৎ হইলেন। গ্রামবাসীরাও ছাত্রদিগের অনুকরণ করিলেন। বঙ্গবালা তাঁহার শ্বেতভুজ উর্দ্ধে নাচাইয়া গাহিতে লাগিলেন।—

এ কারাবাসিনী মা'য়ে যদি কোনগতিকে,
পার উদ্ধারিতে এঁর বধি উপপতিকে।
তবে আজি যাও চলি—ডাকিলে আসিও কালি,

পূজিও মায়ের পদ ভক্তিরসে গলিয়ে,
বন্দিও এ মায়ে, 'বন্দে-মাতরম' বলিয়ে।

এই গান করিতে করিতে যুগলমূর্ত্তি ঊর্দ্ধদেশে চলিয়া গেলেন। জীবানন্দের উপদেশ মত, গ্রামবাসী এবং তথাকার ছাত্রগণ, যাহার যে আবাসে চলিয়া গেলেন। পদচিহ্নের ছাত্রগণকে মহেন্দ্রনাথ সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এবং দূরবর্ত্তী ছাত্রদের গৃহে পৌছিয়া দিবার ভার সন্ন্যাসিগণ গ্রহণ করিলেন। সত্যানন্দের ছাত্রদিগকে, জীবানন্দ সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গ্রামের প্রান্তভাগে এক তৃণবিস্তৃত পড়াভূমিতে আসিলে, জীবানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন, পাঠশালার প্রথামত ছাত্রসকল আপন আপন স্ত্রীর হাত ধরিয়া, এক অপার প্রণয় প্রভাসিত চিত্তে যুগলপ্রাণ এক করিয়া চলিয়াছে। জীবানন্দ কুতুহলাক্রান্ত হইয়া সকলকে তথায় দাঁড়াইতে বলিলেন। তাহারা দাঁড়াইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন। "স্বর্গীয় গুরুমহাশয়ের টোল যখন উঠিয়া গেল, তোমরা তবে এখনও জোড়া মিলিয়া আছ কেন ?" তাহারা বলিল। "গুরুঠাকুর আমাদের জোড়া মিলাইয়া দিয়াছেন, ইহা আমাদের জীবন থাকিতে খসিবে না।" জীবানন্দ বলিলেন। "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে, এবং তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদিগকে সাম্যভাবে ভাল বাস এবং বাসে কি ?"

বালকগণ বলিল। "আমাদের স্ত্রী আমাদের অধিক ভালবাসে।" বালিকাগণ বলিল।—"আমাদের স্বামী আমাদের বেশি ভালবাসে।"

জীবানন্দ প্রীত সহকারে বলিলেন। "তোমরা শেয়ানা হইলে, যদি তোমাদের অভিভাবকেরা অন্যথা বিবাহ দেন!" তাহারা বলিল। "তা করিব কেন ?" জীবানন্দ বলিলেন। "কেন করিবে না।" কল্যাণী বলিল "সে বিবাহ অবৈধ হইবে। স্বামীর উপর স্বামী করা নিষিদ্ধ নহে কি ?" জীবানন্দ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাদিগকে যাহার যে আবাসে পৌছিয়া দিলেন।

গ্রামবাসীরা সত্যানন্দের মর্য্যাদা রাখিয়া, তাঁহার দেওয়া বিবাহ বজায় রাখিয়াছিলেন। দূরের বালক-বালিকাদের পিতা-মাতা এই বিবাহের কথা না জানিবার কারণে অন্যথাও বিবাহ দিয়াছিলেন। কল্যাণীর বিবাহ ভবানন্দের সহিত না হইয়া, মহেন্দ্র সিংহের সহিত হইয়াছিল। (তজ্জন্য যে কত কৌশল এবং কত কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা পরে অবগত হইবেন। এই ঘটনার অনেক দিন পর সত্যানন্দ ঠাকুর কিরূপে প্রকাশ হইয়া পড়েন, তাহাও পরে পাঠ করিবেন।) সত্যানন্দের

(আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি যে নিতান্তই আমাদেরই কপোলকল্পিত, তাহা নহে। আনন্দমঠ গ্রন্থখানি বঙ্কিমবাবুর লেখা হইলেও, দেশের অনেকগুলি নন্দকুমারের অভিমতে উহা লিখিত হইয়াছিল। আনন্দমঠের প্রথমাংশ যাহা আমরা উপরে প্রকাশ করিলাম, সম্রাট ঠাকুরের পাণ্ডুলিপিতে ঐ ধরণের একটা পরিচ্ছেদ পরিদৃষ্ট ছিল। পাছে স্কুল-কলেজের কথা প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে সুদূরদর্শী ও জ্ঞানগম্ভীর অভিমত-দাতারা পরিত্যাগ করিতে বলায়, ঐ অংশ মুদ্রাঙ্কনকালে প্রকাশ পাইল না। বাতাসের মুখে ঐরূপ শুনিয়াছি, সত্যমিথ্যা বলিতে পারিব না, তবে আনন্দমঠ পাঠ করিলে, মনে হইতে থাকে যেন গ্রন্থের প্রথমাংশ, কে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।— যেন প্রমাণ হইতে থাকে যে, মঠে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে, কোন না কোন স্থলে সন্তানদের মধ্যে গাঢ় আলাপ পরিচয় হইয়াছিল, এবং সেই আলাপ কোন টোল বা পাঠশালা-সম্ভূত বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। এই গ্রন্থের এই প্রথমাংশ পরিত্যক্ত হইলে পুস্তকখানিতে যে সকল অসামঞ্জস্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমরা যথা সময়ে দেখাইয়া দিয়া, পাঠকদের বিশ্বাস দেওয়াইতে পারিব।

যে সকল অত্যাশ্চর্য্য প্রক্রিয়া দ্বারা, সত্যানন্দ ঠাকুর জনসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেবতা-দেবীর সম্মান পাইলেন। ঐরূপ ভ্রান্তোদ্‌ভাবী প্রক্রিয়া, অর্থাৎ হস্ত, পদ ও মুণ্ডকাটা খেলা ইদানীং সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল দর্পনোদ্‌ভাবী ছায়াবাজীর কৌশল তৎকালে কাহারও মাথায় স্থান পায় নাই। বিবেচনা করি এই অদ্ভুত লীলার আবিষ্কার-কর্ত্তা স্বয়ং সত্যানন্দ এবং জীবনদাতা আপনি নন্দকুমার ঠাকুরই হইবেন।

'আমরা ভারত সন্তান, ইংরেজ রাজার অধীনে থাকিয়া, যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়া আছি। এবং রাজা আমাদিগকে, দণ্ডবিধি আইনের প্রতাপে যেরূপে হাঁপ ছাড়িয়া কাঁদিতেও দিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় রাজদ্রোহী সাজিয়া রাজ্যটীকে হিন্দুরাজ্য না করিয়া লইতে পারিলে আমাদের উপায়ন্তর নাই।—আমাদের বল-বীর্য্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, রাজ্য চালাইবার শক্তি সকলই আছে। নাই কেবল সাহস।' পরন্তু যাহাতে হিন্দু সন্তানেরা সাহসী এবং সমরী হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বঙ্কিমবাবুর যাবতীয় নভেল লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আনন্দমঠই সর্ব্ব প্রধান।

নভেল ঠাকুর তাঁহার পুস্তকখানি যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা সেইখানে আসিয়াছি।

৭ * কৌশলে কল্যাণীহরণ। * ৭

ঠাকুর তাঁহার উপক্রমণিকায় এক গভীর বন দেখাইয়াছেন। উহার দীর্ঘতা ও প্রশস্ততা যে কত ক্রোশব্যাপী, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সেই মহা-মহীরুহ-ময় শালবনখানি যে, কোথা ছিল তাহার সঠিক ঠিকানাও বলেন নাই। ফলকথা এই বঙ্গদেশেই ঐ আকাশঅন্ধী মহাবন ছিল। তন্মধ্যে অনেক মনুষ্য বাস করিতেন। তাঁহারা ধনসম্পত্তি, এমন কি মনুষ্যের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিতেন।— তাঁহারা ভক্তি বিলাসী মহামনস্বী।

১১৭০ সালের রাক্ষসী দুর্ভিক্ষ, মহামারী সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাতে সকল স্থলই জনশূন্য শৃগাল, কুকুর ও গৃধিণীময় হইয়া যায়। পদচিহ্ন গ্রামটিও অত্যন্ত শোকাবহ ও ভীষণ দৃশ্যময় হইয়াছিল।—হাট-বাজার, পথ-ঘাট, আবাস-প্রবাস, লোকাভাবে সকলই জনশূন্য। এই গ্রামের জমিদারের নাম মহেন্দ্রসিংহ; তিনি যেমন ধনী তেমনি একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। (তিনি ইদানীন্তন ধনী জমিদার পুত্রদের মত নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম কল্যাণী, তিনি যেমন উৎপন্নবুদ্ধি তেমনি সুচতুরা।) তাঁহাদের একটী শিশু মেয়ে আছে। নভেল ঠাকুর বলিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষের প্রপীড়নে তাঁহারা শিশু মেয়েকে ক্রোড়ে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। (এখানে ঠাকুর সত্য কথাগুলি গোপন করিয়াছেন।)—

কল্যাণী মহেন্দ্রকে পাইয়া, পাঠশালার স্বামী ভবানন্দকে ভুলিয়াছিলেন। সে দিকে সত্যানন্দ ঠাকুর এই মহেন্দ্র ও কল্যাণী-সম্বন্ধে মনে মনে স্থির করিলেন 'কোন কৌশলে মহেন্দ্রকে আমাদের দলভুক্ত করিতে ও কল্যাণীকে, তাঁহার পাঠশালার স্বামী ভবানন্দের ভোগে আনিতে পারিলে, আমরা প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইতে পারিব।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি, একদিন ভবানন্দকে বহুবিধ উপদেশ দিয়া পদচিহ্ন গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। ভবানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে পদচিহ্ন গ্রামে আসিয়া, গ্রামের চতুর্দ্দিকে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।—

এ দুর্দ্দিন দুর্ভিক্ষতে মা তোমারে ডেকেছে;

দেখবি কে আয় সে রাজধানী,
প্রবাল আদি মুক্তামণি,
শূন্তে ঝলে সে সিংহাসন কত হীরা টেঁকেছে।
মায়ের ভক্তি আছে যারে,
ঘর সর্ব্বস্ব ছাড়তে পারে,
ডাক্‌ছে তারে, মায়ের ছবি যেজন প্রাণে এঁকেছে,
একা পথে চল্‌তে মা তার ভয় কোন কি রেখেছে?

ভবানন্দ এই গান গাহিতে গাহিতে কল্যাণীশোভী আবাসের দিকে আসিতে লাগিলেন। কল্যাণী এবং মহেন্দ্রসিংহ উভয়েই দ্বিতলের বাতায়নে মুখ রাখিয়া এই চিত্তপোহা গান শুনিতেছিলেন। গানের সুমধুর ঝঙ্কার কল্যাণীর কর্ণে প্রবেশ করিতেই, তাঁহার প্রাণপটে পাঠশালার চিত্র সকল আঁকিয়া গেল। তিনি তখন মনে মনে ভবানন্দকেই তাঁহার যথার্থ স্বামী বলিয়া স্থির করিলেন। এমন সময়ে ভবানন্দ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতে লাগিলেন। ভবানন্দের সেই বিকীর্ণ নয়নের চাহনীসহ সন্ন্যাসীর বেশ, কল্যাণীর নয়নে অতি মনোমুগ্ধকর বলিয়া ঠেকিল। তিনি সটান-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণপাখী তখনি উড়িয়া গিয়া, সন্ন্যাসীর হৃদয়রূপ পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিবদ্ধ হইয়া গেল। কল্যাণী সেই হইতে বিষণ্নমনা হইলেন।)

নভেল ঠাকুর উক্ত কথাগুলি গোপন করিয়া এস্থলে এইরূপ বলিতেছেন,— "কল্যাণীকে বিষণ্না দেখিয়া মহেন্দ্র বুঝিলেন, "গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া কল্যাণীর মন, এ গ্রামে টিকিতে চাহিতেছে না।' কল্যাণী একদিন নিজ হইতেই প্রস্তাব করিলেন। "এ স্থান ত্যাগ করিয়া, রাজধানীতে গমন করিলে অন্নক্লেশ নিবারণ হইতে পারে।" মহেন্দ্রের কোনই অন্নক্লেশ ছিল না, আবার সে বৎসর বেশ কিছু শস্য জন্মিয়াছিল। দুর্ভিক্ষের অবসান হইয়াছিল। তিনি তাঁহার ধনরাশি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে চাহিলেন না। কল্যাণী বলিলেন। "ডাকাতের ভয় করিতেছ!, যদি ডাকাত পড়ে, তবে আমরা দুইজনেই কি রক্ষা করিতে পারিব?" সরলস্বভাব মহেন্দ্র ভাবিলেন। "তাও তো সত্য,—তা একবার বাতাস পরিবর্ত্তনই করা যাউক।" পরন্তু তিনি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। "পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিতে পারিবে তো? দেশে এখন পাল্‌কী বা গাড়ি কিছুই নাই।" কল্যাণী

এইরূপে স্থিরীকৃত হইয়া, তাঁহারা আনন্দমনে ঘর-দ্বার বন্ধ করিয়া, পরদিন প্রভাতে রাজধানীর উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। মহেন্দ্র মেয়েটিকে কোলে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, (কুলি-কাবাড়িদের ন্যায়) পথপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। (পথে খাইবার জন্য ॥০ সের চাউল বা কন্যাটির জন্য এক ঘটি দুগ্ধও সঙ্গে লইলেন না।—ঠাকুরের কি জোর কল্পনা। সমগ্র বঙ্গদেশ তখন এমন দস্যুবিবৃত যে, দশবিশ জন একত্র না হইয়া সে সময়ে কেহ পথ চলিত না। মহেন্দ্র তাহা জানিয়া শুনিয়া, স্ত্রীর ভরসায় তিনি, এবং তাঁহার ভরসায় স্ত্রী, বাড়ীর বাহির হইলেন।—যখন সেই মহা দুর্ভিক্ষে, দেশের দশ আনা রকম লোক বাঁচিয়া গিয়াছিল, তখন মহেন্দ্রের ন্যায় ধনী জমিদার যে সেই দুর্ভিক্ষের কণামাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন; এমন কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।—মহেন্দ্র যে, অন্নকষ্টের কারণে, কোড়া-কুলিদের দশায় 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। এখানে আসল কথা এই যে, ভবানন্দের প্রেম পাইবার জন্য কল্যাণী এই কল্যাণকর-কার্য্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন; এবং ভবানন্দ ছদ্মবেশে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া এবং আকার-ইঙ্গিতে পথ দেখাইয়া, নিরাপদে আনন্দমঠের নিকট আনিয়া, তবে তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন।)

সমস্ত দিন অনাহারে পথ পর্য্যটন করিয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সন্ধ্যার সময়, স্ত্রী-কন্যাকে লইয়া এক চটিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। চটিতেও লোক জন কেহ ছিল না। মহেন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে সেই ভীষণ ভূতাগারে বসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে দুগ্ধের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। (নিকটবর্ত্তী গ্রাম বা রাজধানী এখানে কোথায়! এ যে সন্তানদের ক্রোশব্যাপী শালবন বিবৃত স্থল। এ বনের চতুর্দ্দিক বহুদূর পর্য্যন্ত জনশূন্য।) ঠাকুর তাঁহার সরলবুদ্ধি পাঠকগণকে কেমন বুঝাইয়া বলিতেছেন,—মহেন্দ্র চলিয়া গেলে, একদল অনাহারে শীর্ণকায় লোক, জঠর-জ্বালায় অস্থির হইয়া, কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে তথা হইতে তুলিয়া, এক কাননমধ্যে লইয়া গেল। তাহারা তাঁহার অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া ভাগাভাগী করিয়া লইল। তার পর বুঝিতে পারিল যে, অলঙ্কারে তাহাদের পেট ভরিবে না। তখন তাহারা অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া, 'অন্ন দাও, অন্ন দাও' বলিয়া দলপতিকে আক্রমণ করিল। সেই হাঙ্গামায়, অবসর গ্রহণ করিয়া, চতুরা কল্যাণী কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনের অন্তর্দেশে নানাবিধ কণ্টক-

এবং শিশুর কোমল শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, শেষে এক বিটপীতলে ক্লান্তা হইয়া পড়িয়া গেল। (ঠাকুর এখানে কল্যাণীর সতীত্বের উপর এই প্রথম ছোব রং চড়াইলেন।—দুই তিন ছোব চড়াইলেই কল্যাণী সাবিত্রী সদৃশী-দেবী হইবেন।)

সত্যানন্দ ঠাকুর বঙ্গবালাকে লইয়া, এই বনমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আনন্দে বাস করিতেছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই, তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছেন। ইনি এখন, সন্ন্যাসীর ভাণে রাজদ্রোহী, ব্রহ্মচারীর ভাণে দস্যুদলপতি এবং দেবতার ভাণে কুলবিনাশন লম্পট। (নভেল ঠাকুর এই ডাকাত ঠাকুরের জ্ঞান-গুণ ও চরিত্রাদি, এমন দেবদৃশ ও সুর-সম্ভব করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে, সরলবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রই নিজেকে ঐ ধরণে গঠিত করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে। তাই বঙ্গদেশটি ঐ ধরণের ধার্ম্মিকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের এইরূপ ঠাট-ঠমকের চাহনীতে দেশের কত লোক যে ভস্মীভূত হইল, তাহা কেহ গণিয়া বলিতে পারেন কি?)

কল্যাণী বৃক্ষতলে বসিয়া, এক সুর-সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" সেই সঙ্গীত ক্রমশঃই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। কল্যাণী দেখিলেন, "এক শুভ্র শরীর, শুভ্র শ্মশ্রু, মহা শরীর মহা মুনি, বীণাহস্তে চন্দ্রালোক প্রদীপ্ত; নীল আকাশ পথে গাহিতেছেন 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।' (এই নিবিড় বনের ভিতর নীলাকাশ!—ঠাকুরের কি জমকাল কল্পনা!)

"কল্যাণী সেই ঋষিমূর্ত্তিকে তদীয় দুর্ব্বল কলেবরে প্রণাম করিতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন।—চেতনা পাইয়া দেখিলেন, তিনি এক তরুলতা পরিবেষ্টিত মন্দিরে। ঋষিবর তাঁহাকে বলিতেছেন। "মা, এই দেবতার ঠাঁই শঙ্কা করিও না।—একটু দুধ আছে তুমি খাও। তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।" (কল্যাণী গাছতলায় পড়িয়া আছে, সে সংবাদ এই ঋষিবরকে কে দিল? ঋষিবর অন্তর্যামীই বটে। আর ঠাকুরের পাঠকেরাও পাটনাই পাঁঠা নয় কি? বলি ঠাকুর! কল্যাণী চৈতন্যহীনা হইলে, বৃক্ষতল হইতে কে তাহাকে মঠে আনিল? সে পবিত্র স্থলে কোন্ দুরাত্মা এই পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিল?—তাই বলি, এমনি করিয়াই কি সরলবুদ্ধি পাঠকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফাঁসকাঠে তুলিতে হয়?)

(নভেল ঠাকুর বলিতেছেন, কল্যাণীকে সত্যানন্দ ক্রোড়ে করিয়া মঠে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে।—জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ এবং জ্ঞানানন্দ

কল্যাণীর বিবাহ মহেন্দ্রের সহিত হইয়া গেলে, পঞ্চপ্রভুতে মিলিয়া পরামর্শ হইল যে, কোন গতিকে উহার স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া, ভবানন্দকে দান করিতে হইবে। এবং মহেন্দ্রকে সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইতে হইবে। তাই ভবানন্দ সন্ন্যাসীর বেশে কল্যাণীকে দেখা দেন। কল্যাণীও স্বামীকে লইয়া গৃহত্যাগ করেন। মহেন্দ্র সস্ত্রীক গৃহত্যাগী হইলে, ভবানন্দ গুপ্তভাবে সমস্ত পথ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। চটিতে আসিয়া মহেন্দ্র দুগ্ধের জন্য গমন করিলে, ভবানন্দ কল্যাণীকে চটি হইতে তুলিয়া আনন্দমঠে আনিয়া সত্যানন্দের নিকট রাখিয়া, কোম্পানীর খাজানা লুণ্ঠনে চলিয়া যান!—নভেল ঠাকুরের হুকুম-শক্তি দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তিনি এখানে কতক গুলা মড়াখোর দেখাইয়াছেন। ঠাকুরের কথাই যদি সত্য হয়, তবে এই মড়াখোরেরা সত্যানন্দের প্রেরিত লোক, কেন না তিনি মহেন্দ্রকে পাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। আর এই বনে স্বতন্ত্র ডাকাত থাকা সম্ভব কি?)

কল্যাণী সত্যানন্দকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি সেই দুগ্ধ পান করিলেন না। তখন সত্যানন্দ তাঁহাকে দেবীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, বঙ্গবালা শূন্যশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কল্যাণী তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। দেবী তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দান করিলেন, কল্যাণী তাহা করিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন।*

দেবী কল্যাণীকে একটি বটী দিয়া বলিলেন। "এই বটিকা তুমি কোন এক নদীতীরে বসিয়া ভক্ষণ করিও, ইহাতে তোমার মৃত্যু হইবে। কিন্তু ভবানন্দ তোমার নিকট গমন করিলেই তুমি, আবার জীবন পাইবে। তুমি যদি এরূপে জীবন পরিবর্ত্তন না কর, তবে কিছুতেই তোমার সত্যস্বামীকে পাইবে না।" কল্যাণী তাঁহার সকল আদেশই পালন করিতে স্বীকার করিলেন।

"সত্যানন্দ এইবার মহেন্দ্রের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন।—ইংরেজদের খাজানা লুণ্ঠন করিবার মানসে একশত দস্যু পর্ব্বতকন্দরে বসিয়াছিল। সত্যানন্দ তাহাদের নিকট যাইয়া ভবানন্দকে ডাকিয়া লইলেন; এবং তাঁহাকে নির্জ্জন স্থলে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভবানন্দ! মহেন্দ্রের কোন সংবাদ রাখ কি?" ভবানন্দ বলিলেন "মহেন্দ্র সিংহ, স্ত্রী-কন্যা লইয়া অদ্য প্রভাতেই গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। (এ কথা ভবানন্দ কেমন করিয়া জানিলেন?—যদি ভবানন্দ, সমস্ত পথ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিতেন, সে অবস্থায় তাঁহারা নিরাপদে পথ চলিতে পারিতেন কি? এবং একাকী আনন্দমঠে আসিতেই পারিতেন কি?—"উপপতির বাড়ী যাই ঠাকুর

(এই সকল বঙ্কিম-কল্পনা আমাদের মাথায় মাথায় এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে যে, দেশের হিতের জন্য যখনই আমরা একটা সৎকার্য্য করিতে দাঁড়াই, তখনি এই দুষ্ট কল্পনা সম্মুখে আসিয়া আমাদের সেই কার্য্যের নেতৃত্ব করিতে দাঁড়ায়, এবং আমাদিগকে যেন যাদুমুগ্ধ করিয়া বিপরীত পথে লইয়া যায়। আমরা বুদ্ধিদোষে সেই কুপথে প্রবেশ করিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হই, জেলেও পচি, ফাঁসকাঠেও চড়ি, কালাপানিও গমন করি; তথাপি আমরা আমাদের ঘাড়ের সেই শয়তানকে তাড়াইবার বুদ্ধি সঞ্চয় করিতে পারি না। এই ইব্‌লিসবুদ্ধিই আমাদের বিগত আন্দোলনটিকে পণ্ড করিল,অনুশীলনসমিতি খুলিয়া অপমানসাগরে ভাসিলাম এবং বোমা বারুদেও ঠকিলাম। যদি আমরা এই ইব্‌লিসবুদ্ধির অনুগামী না হইতাম, তবে এতদিনে অনেক উন্নতি করিতে পারিতাম। আমাদের ঘাড়ে এই ইব্‌লিস থাকিতে, কোন যুগেই আমরা উন্নতি করিতে পারিব না; তাহা স্থির নিশ্চয়। যখন যে জাতি উন্নতি করে, তখন সে জাতির উন্নতি, বুদ্ধি হইতেই আরম্ভ হয়। আমরা অবনতির বুদ্ধি লইয়া উন্নতি করিতে দাঁড়াইয়াছি।)

সত্যানন্দ ঠাকুর, কোন এক কৌশলকর পন্থায় কল্যাণীকে অপহরণ করিবার মানসে ভবানন্দকে বলিলেন। "তুমি মহেন্দ্রকে আনিয়া, তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার জিম্মা করিয়া দাও।" এইরূপ সাধু-সম্ভব আদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ভবানন্দ মহেন্দ্রের উদ্দেশে গমন করিলেন। (ঠাকুর এখানে সত্যানন্দকে ধার্ম্মিক করিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে ধর্ম্মের ভাণে একজন ইব্‌লিস্ নিন্দ-নারকী।)

৮ * সন্তানদের ফাঁদ। * ৮

"পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহী, গাড়ীর অগ্র-পশ্চাতে সঙ্গীন খাড়া করিয়া খাজানার টাকা লইয়া কলিকাতায় কোম্পানীর ধনাগারে যাইতেছিল। (নভেল ঠাকুর এই ধন, নিতান্ত অবৈধ ভাবে লুণ্ঠন-করা-ধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের শেষাংশে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম—ঠাকুর নিষ্ঠীবন উৎক্ষিপ্ত-করণে পরম পটু।) গাড়ীর পশ্চাতে সৈন্যাধ্যক্ষরূপে একজন ইংরেজ অশ্বারোহণে ছিলেন। মহেন্দ্র সিং সেই পথ দিয়া চটিতে আসিতেছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে চোর মনে করিয়া, দুই চারিটা কড়া কথা বলায়; বাঙ্গালিবীর, ক্রোধ সামলাইতে না পারিয়া

লুঠিতে লাগিল। (বাঙ্গালীরা যে কেমন বীর, নভেল ঠাকুর তাহা ঐ চড়ের ভিতর দিয়া দেখাইয়া, চিরকাপুরুষদিগকে দাম্ভিকতার শিক্ষা দিয়াছেন। যাহার কুফল এখন আমাদের পোড়া কপালে ভীষণ ভাবে ফলিতেছে।)

তিন চারি জন সিপাহী মিলিয়া (তবে) মহেন্দ্রকে ধরিয়া সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সাহেব নেশায় এমন চুর ছিল (অথচ সে ঘোড়া হইতে পড়ে নাই।) যে, নেশার ঘোরে বলিল। "সালাকো পাকাড়কে শাদী কর।" (মহেন্দ্রের উপর যে সকল অশ্লীল অত্যাচার হইয়াছিল, পাছে তাহা প্রকাশ পাইয়া, বীর বাঙ্গালীর প্রাণকে ভীত করিয়া তোলে, সেই ভয়ে নভেল ঠাকুর সাহেবকে মাতাল এবং পুরুষে পুরুষে বিবাহ হওয়া অসম্ভব বলিয়া, কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।)

"নভেল ঠাকুর বলিতেছেন।—সিপাহীরা মহেন্দ্রকে চলন্ত গাড়ীর উপর ফেলিয়া চাকার সহিত তাঁহার হাত বাঁধিয়া রাখিল। (ঠাকুরের মাথাটা সেই চলন্ত চাকায় বাঁধিলে সম্রাটী বুদ্ধিটায় একটু শাণ পড়িতে পারিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, চলন্ত চাকার সহিত হাত বাঁধা সম্ভব কি অসম্ভব।) ভবানন্দ মহেন্দ্রকে খুঁজিতে ছিলেন। সিপাহীরা তাঁহাকেও চোর মনে করিয়া, সেই গাড়ীর উপর বাঁধিয়া রাখিল। ভবানন্দ মহেন্দ্রকে চুপি চুপি বলিল। "আমি তোমাকে চিনি, সে কথা পরে হইবে, তুমি এখন হাতের দড়িটা চাকার উপর রাখ, দড়ি কাটিয়া গেলে আমি তোমাকে উদ্ধার করিয়া লইব।" (পাঠক বুঝিলেন কি,—মহেন্দ্রের সহিত ভবানান্দর চেনাশোনা কোথা হইল?—পাঠশালার কথাগুলি আনন্দমঠে পরিত্যাগ করা হইয়াছে কি না?)

"গাড়ী কিয়দ্দূর যাইতেই জীবানন্দ সেই কন্দরস্থ এক শত ডাকাত লইয়া, সিপাহীদের আক্রমণ করিলেন। সাহেবকে প্রথমেই এক গুলী মারিতেই সে তখনি মরিয়া গেল। সিপাহী কয়জনকে ফুঁ দিয়া উড়াইয়াদিল। (বোমা বাহিনীরা এই অংশ পাঠ করিয়া, মাথায় আঁটিয়া লইয়াছেন যে, 'যখন পাঠশালার ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া এমন বীরত্ব দেখাইতে পারে, তখন আমরা স্কুল-কলেজের, সায়েন্স পড়া, ড্রিল করা ছাত্র এবং বঙ্কিম-বুদ্ধিতে সুপুষ্ট-মাথা, আমরা দল বাঁধিলে, ইংরেজ কয়টাকে তুঁষ-পাঁস করিয়া দিব।' (তাই বলি: ইংরেজ, তুমি গরিবের ছেলে, কেন বিদেশে প্রাণ দিবে। রাজ্যটি ছাড়িয়া তক্তা বুকে করিয়া মানে মানে ভাসিয়া পড়। বাঙ্গালীর বজ্রাঘাতে অনর্থ প্রাণ দিও না। আর তোমরাই যখন এই তুষ্য বিদ্যা বিতরণ করিয়া

সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, যেন হিন্দুরচিত কোন গ্রন্থ মুসলমানদিগকে পড়ান না হয়। আর যদি একান্তই পড়ান হয় তবে হুজুগ উঠিলে সে দোষ তোমার।)

(এই বঙ্কিম-কল্পনা, বাঙ্গালীর মাথায় এমন ক্ষোদিত অক্ষরে বসিয়া গিয়াছে যে, এই স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা, তাহাদিগকে যেমনই পরামর্শ দিউন না কেন, সে কথা তাহাদের মাথায় প্রবেশ করিবামাত্র বঙ্কিমের ছাঁচায় গঠিত হইয়া যায়; ফলে আন্দোলনটা আনন্দমঠের অভিনয়প্রায় হইয়া দাঁড়ায়। তাই বলি, দেশে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী থাকিতে, কোন আন্দোলনে এ দেশের উন্নতি হইবে কি?)

যুদ্ধের সময় মহেন্দ্র সিং, সন্তানদের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করিয়া, সাজিয়াছিলেন।—কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন। 'ডাকাতদের সহায়তা করা অধর্ম্ম।' তাই তিনি সন্তানদের সহায়তা করেন নাই। (নভেল ঠাকুরের এ কথাটিও কৌশল শূন্য নহে। তিনি এই কথাটির ভিতর দিয়া দেখাইতেছেন যে, যাহারা তলাইয়া বুঝিতে না পারে তাহারাই এই স্বদেশ হিতৈষী মহাপুরুষদিগকে ডাকাত মনে করিয়া লয়। মহেন্দ্র সিংহও তাহাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু—মহেন্দ্র যে একজন মস্ত ধনী এবং বীরপুরুষ হইবার কারণে সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে দলভুক্ত করিয়া লইবার মানসে, তাঁহার উপর এইরূপ সর্ব্বস্বান্তকর চালান-মন্ত্র ছাড়িতেছে, ঠাকুর আমাদিগকে সে কথা কিছুতেই বুঝিতে দিতেছেন না।)

"লুণ্ঠিত ধনরাশি জীবানন্দের দ্বারা বনমধ্যে চালান করাইয়া দিয়া, ভবানন্দ মহেন্দ্রকে তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন। "তুমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। তুমি আমাদের সহিত যুদ্ধে যোগ দিলে না কেন?" মহেন্দ্র বলিলেন। "তোমরা দস্যু তাই!" ভবানন্দ বলিলেন। "তোমার ভ্রম।—ইংরেজেরা জগজ্জনের মাথা মুড়াইয়া, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে।—উহারা এ দেশের দস্যু, অথবা আমরা?—মুসলমানেরাও আমাদের সুজলা-সুফলা জননী জন্মভূমির সর্ব্বনাশ করিতেছে।—তাই আমরা, স্ত্রী-পুত্রাদি সংসার-মায়া পরিত্যাগ করিয়া, মায়ের উদ্ধারে দাঁড়াইয়াছি, তোমাকেও আমাদের সহিত যোগদান করা উচিত!—তুমি সন্তান হইবে?—মহেন্দ্র 'না' বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন। "সন্তান নাই হও ক্ষতি নাই!—তোমার স্ত্রী-কন্যা লইয়া যাও।"

মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যার নাম শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ নাগের ন্যায় ভবানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভবানন্দ তাঁহাকে অনেকরূপে বুঝাইলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কিছুতেই স্ত্রী-কন্যার মায়া

রণমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া দেবমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলম, শস্য শ্যামলং মাতরম।" ইত্যাদি।—সরল বিশ্বাসী মহেন্দ্র তাঁহার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন। "এ তো দেশ, এ তো মা নয়?" ভবানন্দ। "দেশই আমাদের মা, দেশ উদ্ধার করা অমাদের ব্রত।—আমরা অন্য মা জানি না। দেশই আমাদের মাতা, আমরা তাঁহার সন্তান। আমরা তাঁহাকেই পূজা করি।" ভবানন্দ গান গাহিতে গাহিতে কত কাঁদিলেন, কতরূপ ভাণ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই মহেন্দ্রের প্রাণ গলিল না। তার পর দেশের দুরবস্থা দেখাইলেন, নেশাখোর নেড়েদের অত্যাচার বর্ণনা করিলেন; হিন্দুদের ভীরুতা প্রকটিত করিলেন। সন্তান-সম্প্রদায়ের গুণগ্রাম বল-বীর্য্য, সাহস-উদ্যম ও অভ্যাসাদি পবিত্র চরিত্রাবলী অবগত করাইলেন।—মহেন্দ্র ক্রমে ক্রমে ভবানন্দের সহিত গান করিতে লাগিলেন।" (নভেল ঠাকুর এইরূপে হিন্দুর মাথায় মোস্‌লেম বিদ্বেষ এমন ভাবে আঁকিয়া দিয়াছেন যে, এই একতারযুগেও ঐ বিদ্বেষভাব মাথাত্যাগ করিতে চাহিতেছে না।—নভেল গুলির উচ্ছেদের আগে একতা হইবে কি? আর পতিতজাতিকে যে ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত করিলে, সে ভ্রান্তিপথে আসিয়া থাকে, ঠাকুর এখানে সেই ভাবেই চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন।

সেদিকে সত্যানন্দ ঠাকুর মঠের উপর হরিণাজিনে বসিয়া,—কি করিলে মহেন্দ্র সন্তান-দলভুক্ত হইবে, জীবানন্দের সহিত সেই পরামর্শ করিতেছিলেন। জীবানন্দ বলিলেন।—"কল্যাণী থাকিতে, মহেন্দ্রকে পাইবার কোনই উপায় নাই।—যেমন, পাঠশালার আরও কয়েকটি বালিকার জীবন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, কল্যাণীরও সেইরূপ করা হউক।—যে কৌশলে, তাহারা পাঠশালার স্বামী পাইয়াছে, সেই কৌশলে কল্যাণী ভবানন্দের হউক। তাহা হইলে স্ত্রীহারা মহেন্দ্রকে অতি সহজেই হস্তগত করিতে পারিব।"

সত্যানন্দ। "তবে তাহাই কর!—তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে না।—আর স্বয়ং কল্যাণী যখন ভবানন্দের দিকে মুখ তুলিয়া বসিয়া আছে, তখন এ কাজ সহজেই সম্পাদিত হইবে।—বঙ্গবালার উপদেশে কল্যাণীর ধারণা জন্মিয়াছে যে, মহেন্দ্রের সহিত সে পাপ করিতেছে, তাহার সত্যস্বামী ভবানন্দ।" এই বলিয়া, সত্যানন্দ জীবানন্দকে প্রশ্ন করিলেন। "সন্তান-ধনাগারে কত টাকা জমিল?" জীবানন্দ বলিলেন। "আড়াই কোটি।" (আমাদের ধনাগারেও ঐ পরিমাণ। কিন্তু আড়াই কড়ার কাজ সেকালেও পাওয়া যায় নাই, এ কালেও না।)

এমন সময় মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিষ্ট মুখে আলাপ করিলেন। এবং স্ত্রী-কন্যার সহিত দেখা করাইয়া দিবার ভাণে, তাঁহাকে দেবালয় দেখাইতে লইয়া গেলেন। (নূতন ঠাকুর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, 'সন্তানেরা জননী জন্মভূমি ভিন্ন, আর কাহাকেও পূজা করেন না।—ঠাকুর সে কথা ভুলিয়া গিয়া, মহেন্দ্রকে সতেরগণ্ডা দেবী দেখাইয়াছেন, দস্যুদেবী-কালীঠাকুরকেও দেখাইতে ভোলেন নাই। গ্রন্থের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আমরা দেবালয়ে একটি মাত্র দেবী দেখাইব।)

সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে লইয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্র দেখিলেন সত্যানন্দ এবং বঙ্গবালা, দেবতার ন্যায় বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আছেন। মহেন্দ্র দণ্ডবৎ হইলেন, উঠিয়া দেখিলেন মূর্তিদ্বয় বেদী ছাড়িয়া শূন্যে দাঁড়াইয়া আছেন।— জীবানন্দ বলিলেন। "অন্য মন্দিরে চলুন।" মহেন্দ্র ফিরিতেই দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে সত্যানন্দ ঠাকুর পাষাণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে দেবতা-দেবী কেহই নাই। মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া স্তিমিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তিনি তখন সমুদয় জগৎ নিরাকার এবং সেই দেবীময় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া গেল। নয়ন, দেবীময় হইল, রসনা, ধর্ম্মসঙ্গীত করিতে চাহিল, শ্রবণেন্দ্রিয়, ধর্ম্মগান শুনিতে উৎসুক হইল। তিনি 'বন্দে মাতরম্' গাহিতে লাগিলেন।

জীবানন্দ তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে দেখিলেন বঙ্গবালা এক সুন্দর শূন্য-শয্যায় পদলম্বিত করিয়া বসিয়া গান করিতেছেন। আর যেন অদৃশ্যে বসিয়া অপ্সরীগণও তাঁহার সুরে সুর মিলাইতেছেন। যেন শত কণ্ঠ এক সঙ্গে সপ্তম সুরে উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সেই সুর ধরিয়া জীবানন্দও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গান করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন জীবানন্দ কই!—যিনি গান করিতেছেন তিনি সত্যানন্দ। মহেন্দ্র একেবারে অচল মূর্ত্তিবৎ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনিও সত্যানন্দের সহিত গান করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র এক নয়নে দেবীর দিকে চাহিয়া গান করিতেছিলেন। দেবী শূন্য-শয্যা ত্যাগ করিয়া যেমন নামিতে গেলেন, অমনি নিম্নভূমে পড়িয়া না গিয়া চক্ষের পলকে অদৃশ্যা হইলেন। (ইহারই নাম পণ্ডিত-বুদ্ধি-কৌশল, এই ফাঁদে গভীর গবেষণা শূন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরাই পড়িয়া থাকে।)

দস্যুদের চক্রান্ত না বুঝিয়া মহেন্দ্র সিংহের ভক্তিসাগর উথলিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার ভক্তিরাশি প্রকাশ করিতে না পারিয়া, [illegible]

লাগিলেন। সত্যানন্দ তাঁহার নয়নজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন। "তুমিও মায়ের সন্তান হও না কেন?" মহেন্দ্র বলিলেন। "স্ত্রী-কন্যারাই আমার গলার পাপ। আমি সস্ত্রীক সন্তান হইতে পারি।" সত্যানন্দ বলিলেন। "তাহা হইবে না, বরং তুমি স্ত্রী-কন্যা গৃহে রাখিয়া আইস।" মহেন্দ্র শেষে তাহাই স্বীকার করিলেন। পরন্তু জীবানন্দ তাঁহাদের তিনজনকে সঙ্গে করিয়া, সেই গোলকধাম রূপিণী বন পার করিয়া দিলেন। সেই বনের পার্শ্ব দিয়া যে একটি পথ ছিল, তাঁহারা সেই পথে উঠিবার পর জীবানন্দ তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহেন্দ্র কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া, কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া, সেই পথ ধরিয়া বনের পার্শ্বে পার্শ্বে বরাবর চলিলেন, বন ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, তাঁহারা এক চলোর্ম্মি-চঞ্চল নির্ম্মল-নির্ঝর তীরে আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই নদীর শীতল জলে হস্তপদ-বদনাদি প্রক্ষালন করিয়া, তীরবর্ত্তী এক বৃক্ষছায়ায় শ্রান্তিদূর করনার্থ উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে কল্যাণী বলিলেন। "গতকল্য রজনীতে আমি জননী জন্মভূমির দর্শন করিয়াছিলাম। মা আমার খুটে একটি বটি বাঁধিয়া বলিয়া দিয়াছেন।—যেখানে নির্ঝর দেখিবে, সেইখানে এই বটির সেবন করিবে। আরও বলিয়াছেন 'যদি তুমি এই বটি ভক্ষণ না কর, তাহা হইলে মহেন্দ্র আমার ভক্তি করিবে না; আমাকে ম্লেচ্ছদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিবে না।—এই তো আমরা নির্ঝর তীরে আসিয়াছি, এখন বল কি করি!"

মহেন্দ্র বটি দেখিয়া বলিলেন। "যদি ইহা বিষবটি হয়! তবে যে আমি চিরদিনের জন্য তোমাকে হারাইব।—ইহা তুমি ভক্ষণ করিও না।"

কল্যাণী। "তখন জানা যাইবে যে, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি দেশোদ্ধার করিতে দাঁড়াইবে না, তাই দেবী আমার মৃত্যু কামনা করিয়াছেন।—দেবী আরও বলিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করি, তবে প্রথমে আমার কন্যা মরিবে, তার পর তুমি, তার পর আমি লম্পটদের হাতে পড়িয়া, অত্যাচারে জরজর হইয়া জঘন্য মরণে মরিব। এবং আমার আত্মা একাকী নরকে যাইয়া পড়িবে।" এই কথা লইয়া দুইজনে এক গ্রন্থিময় চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। কি করিবেন কোনই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এই অবসরে সেই বটিকা, কখন কি করিয়া, কন্যাটি আপন মুখে ফেলিয়া দিয়া, নয়নদ্বয় কপালে তুলিয়া রুদ্ধনিশ্বাস হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। কল্যাণী হতবুদ্ধি হইয়া, সেই বটিকা তাহার গলা হইতে বাহির

(কল্যাণীর পাপ কিসের?—পাঠক বুঝিলেন কি, এ পাপ সে মহেন্দ্রের সহিত করিতেছে।) তোমরা বাঁচিয়া থাক আমি স্বর্গে চলিলাম।" (নভেল ঠাকুর বলেন, কল্যাণী এই বটি-বাড়ী হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি দেবীকে স্বপ্নে দেখিয়া, তাঁহার আদেশমত প্রাণত্যাগ করেন। এবং এই স্বপ্নটিকে তিনি এতদূর চিত্তপোহা করিয়া অঙ্কন করিয়াছেন যে, পাঠকেরা সেই মায়া-স্বপ্নের বাহারে বিভোর হইয়া স্মৃতিবিলুপ্ত হইবামাত্র, অমনি ঠাকুর তদীয় দুষ্ট-কল্পনাসকল তাঁহাদের মাথায় মাথায় ভরিয়া সিমেণ্ট করিয়া দিলেন;—তাই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, 'দেশোদ্ধারের জন্য স্ত্রী বা পুত্রকন্যার বর্জ্জন কেন?' ইন্দ্রিয়বিলাসী সন্তানেরা কল্যাণীর সর্ব্বনাশ করিতে দাঁড়াইয়াছে। এই সামান্য কথায় যাহাদের প্রবেশ নিষেধ, সেই পতিতবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই স্বদেশী আন্দোলনের সন্তানদিগকে কবে চিনিবে, এদের ফাঁদ কবে বুঝিবে? কল্যাণীর মৃত্যুর পর সন্তানেরা কিরূপে খেলা দেয়, পাঠক তাহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া যাইবেন।—আনন্দমঠের সকল রহস্যই চক্ষে দেখিতে থাকিবেন।)

পাঠক একটু মনোযোগ দিয়া বুঝিয়া চলুন।—কল্যাণী সেই বটিভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিলেন। পোড়ার মুখো সত্যানন্দ, কেন এই সময়ে গান করিতে করিতে কোথা হইতে, কি মানসে মহেন্দ্রের নিকট আসিয়া তাঁহার শোক দুঃখের ভাগী হইল? দুষ্টেরা কি মহেন্দ্রের অনুসরণে ছিল না?—আবার এই কৌশলবৃত্তি সন্তানেরা সরকারী পুলিষ সাজিয়া, গত রাত্রির ডাকাতী উপলক্ষ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহারা সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে চোর বলিয়া গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল। এই পুলিষ যদি সত্য পুলিষ হইত, তবে কি তাহারা কল্যাণীর শবদেহ আর অবলা কন্যাকে নিরাশ্রয় ফেলিয়া যাইত?—তার পর জীবানন্দ, কেন, কি উদ্দেশে সেখানে আসিল?—কেনই বা শবদেহ রাখিয়া শিশু কন্যাটিকে লইয়া চলিয়া গেল?—(ঠাকুর তোমাকে স্বপ্ন দেখাইয়া এতদূর লুপ্তবুদ্ধি করিয়া লইয়াছেন যে, এ সকল প্রশ্ন করিবার বুদ্ধি তোমাতে বজায় রাখেন নাই। পাপিষ্ঠ সন্তানদের এই সামান্য খেলার মর্ম্মে যদি প্রবেশ করিতে না পার, তবে তোমরা দাসবুদ্ধি না রাজবুদ্ধি তাহা বলিতে পার কি? তোমরা এই চলিত আন্দোলনের খেলাই বা বুঝিবে কবে?)

ঠাকুর বলিয়াছেন, "ভবানন্দের ঔষধে কল্যাণী জীবন পাইয়াছিল। সে ঔষধ কিরূপ তবে শুনুন।—অবশেষে ভবানন্দ আসিলেন। কল্যাণীর পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার অধর যুগলে এক যোড়া চুম্বন-ঔষধি দান করিলেন। সেই শোণিতোত্তাপী

উঠিল। তিনি খিল খিল করিয়া হাসিয়া ভবানন্দের গলা ধরিয়া উঠিয়া বসিলেন। ভবানন্দ আবার তাঁহাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। "বটির সেবনে কোনরূপ নেশা হইয়াছিল কি ?"

কল্যাণী ভবানন্দের হাত ধরিয়া, পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া বলিলেন। 'আমি নেশায় নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিলাম। তুমি আসিবার কিছুক্ষণ অগ্রে, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল।' ভবানন্দ বলিলেন। "তবে আপনা হইতে জাগিলে না কেন ?" কল্যাণী তখন এক অপরূপ ভঙ্গিমার সহিত কহিলেন। "বিনা ঔষধে বিষেজরা মানুষ বুঝি জাগিতে পারে ?"

ভবানন্দ আবার কল্যাণীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন। "তোমার তো জীবন পরিবর্ত্তন হইল, এবার তুমি কাহার হইবে ?" কল্যাণী বলিলেন। "যাহাকে পথে ঘাটে চুম্বন দিয়াছি, যাহার সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছি, যাহাকে পাঠশালায় বসিয়া ভালবাসিয়াছি, যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া এতদূর করিয়াছি—আমি তাহারই।" ভবানন্দ তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন।—"চল তোমাকে আমার ঠানদিদির নিকট রাখিয়া আসি।" কল্যাণী। "আর তুমি ?" ভবানন্দ। "আমি মাঝে মাঝে আসিয়া, তোমার প্রেম-সরসীর রাজহংস হইয়া সন্তরণ দিব।"

(পাপপ্রিয় সত্যানন্দ কি জানিতেন না যে, কল্যাণী জীবন পাইয়াছেন। তবে তিনি মহেন্দ্রকে এইরূপ মিথ্যা বলিলেন কেন ? "সন্তানেরা তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে। তোমার কন্যাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।"—এই 'সৎকারের' ভাবার্থ তবে কি ?—ধন্য তোমাকে বঙ্কিম বাবুর পতঙ্গবুদ্ধি পাঠক ! এই সকল পড়িয়া, বুদ্ধিবিলুপ্ত হইয়া একাকী জলন্ত অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছ !)

সন্তানেরা ভাণ পুলিস সাজিয়া, সত্যানন্দ এবং মহেন্দ্রকে, এক ভাণকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সাহস দিয়া বলিলেন। "চিন্তা নাই, আমাদের দেবী, এখনি আমাদের মুক্তিদান করিবেন।" সেই মুহূর্ত্তেই একজন সন্তান আসিয়া তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিয়া বলিল। "রক্ষীব্যাটাকে ভাং খাওয়াইয়া দিয়াছি। ব্যাটা পড়িয়া আছে, আমি চাবি লইয়া কারামুক্ত করিলাম। চলিয়া আসুন।" মহেন্দ্র দেবীর মহিমায় বিস্মিত হইলেন। আমরাও কবির কল্পনা দেখিয়া হতজ্ঞান এবং পণ্ডিতবুদ্ধির বিশ্বাস দেখিয়া নির্ব্বাক হইলাম।

৯ ❋ জীবানন্দের জীবনী। ❋ ৯

জীবানন্দ কল্যাণীর কন্যাটিকে লইয়া, ভরুইপুরের নিকটবর্ত্তী এক বেনাম গ্রামে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনী নিমাইমণির বিবাহ হইয়াছিল। নিমাই সেই মেয়েটিকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। এবং ভাইকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। (ঠাকুর এখানে মহাপ্রভু জীবানন্দের উদরটা চাবাড়ে ধরণের করিয়া আঁকিয়াছেন।) জীবানন্দ ভগ্নির অনুরোধ রাখিয়া আহার করিলেন। সন্ন্যাসীমানুষ, বেশী কিছু খাইতে পারিলেন না।—চাবাড়ে থালের দুইথাল ভাত, তদুপযুক্ত ব্যঞ্জন ও দাল, তার উপর একটি কাঁটাল খাইয়া বলিলেন। "আর কি আছে?—আনি!" নিমাইয়ের ঘরে আর কিছুই ছিল না, তিনি আর কিছুই খাওয়াইতে না পারিয়া বলিলেন। "দাদা! আমার মাথা খাও, একবার শান্তিমণির সহিত দেখা করিয়া যাও।"

চির অশান্তা, প্রেমোন্মত্তা শান্তিমণি, তাঁহার পাঠশালার জীবনীতে কাঁচা-কোঁচা দিয়া কাপড় পরিতেন। গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়াও শ্বশুর-শাশুড়ীর অবিরত তর্জ্জন এবং তিরস্কারাদিতে তাঁহার সেই অভ্যাস ছুটিল না। তাঁহার যৌবনোদয় হইলে (নভেল ঠাকুর বলেন তিনি ঘর হইতে পলায়ন করিয়া, একদল সন্ন্যাসীদের সহিত অনেক দিন এলো মাঠে চরিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নহে।) তিনি ধীরানন্দের সহিত গৃহ ত্যাগিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঠশালার স্বামী দুই জন। ধীরানন্দ এবং জীবানন্দ। সেই জন্য তিনি ধীরানন্দের সহিত প্রেম করা অবৈধ বিবেচনা করেন নাই। শান্তিমণি তাঁহার যাবতীয় দোষগুণ বঙ্গবাসীদের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন কি না, পাঠকেরা যেন তাহা সকল স্থলেই বিবেচনা করিয়া দেখেন। কিছু দিন এ দেশে সে দেশে ভ্রমণ করিয়া, শেষে ধীরানন্দ আনন্দমঠের অপার আনন্দে মজিয়া গিয়া, শান্তিমণিকে আবার তাঁহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া যায়।—শ্বশুর মরিয়া গিয়াছিল, শাশুড়ী সেই কালামুখী বধূকে গৃহে স্থান দিলেন না, দেশের লোকও তাঁহাকে ঘৃণা করিলেন। জীবানন্দ আসিয়া নিমাইমণির ঘরের পার্শ্বে একটি ঘর তুলিয়া, শান্তিকে তথায় রাখিয়া দিলেন।

বঙ্গবালাও দুই স্বামীর পত্নী।—সত্যানন্দ এবং জীবানন্দ। তিনি ভালবাসার ভাগটা, জীবানন্দকে এবং ভক্তির ভাগটা সত্যানন্দকে দিয়াছিলেন। সেই জন্য জীবানন্দ শান্তিকে একপ্রকার ভুলিয়া থাকিতেন।

রঞ্জিত যৌবনে দেদীপ্যমানা প্রফুল্লবদনা, শান্তিমণি প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে বসিয়া বস্ত্র সেলাই করিতেছিলেন, এমন সময় জীবানন্দ তাঁহার নিকেতনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তি জীবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, ছল ছল নয়নে কহিলেন। আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন?" জীবানন্দ তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া, বদন-চন্দ্রমায় এক স্নিগ্ধকর চুম্বন দান করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন। "কেন, জান না? ধীরানন্দের মুখাগ্নি করিবার জন্য।—এইবার বল দেখি, তুমি আমাকে বিবাহ করিয়াছিলে কেন? শান্তি নির্ভয়ে বলিলেন। "বঙ্গবালার প্রাণোজ্জ্বল করিবার জন্য।—তা যেখানেই থাক না কেন, মাঝে মাঝে এক বার করিয়া দেখা দিলে, কেহ যে কাহার উপর প্রশ্ন করিতে পারিত না।"

জীবানন্দ। "আমি যেখানে আছি তুমি কি তাহা জান না।—আমার আসিবার উপায় নাই। তোমার পিত্রালয়, ইচ্ছা করিলে তুমি তো যাইতে পার!"

শান্তি। "কেবল পিত্রালয় হইলে যাইতে পারিতাম।—সে যে আবার সতীনা-লয়।—আবার শুনি সেখানে রমণীর আদর নাই।" জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন। "যথেষ্ট আদর আছে। সেইখানে, এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের পর, দশ আনা রকম নারী এবং ছয় আনা রকম পুরুষ হইয়াছে। সকল রমণীই পুরুষরূপে সন্ন্যাসী সাজিয়া থাকে। চিনিবে এমন সাধ্য কার! আমাদের সেই শান্তিবনে হিংসা-দ্বেষ নাই। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান। আমাদের আমোদ-প্রমোদ ইচ্ছানুরূপ। সেখানে কেহ কাহার স্ত্রী নহে; অথচ সকলেই সকলের স্ত্রী।—যদি আমাদের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পার, তবে সেখানে যাইও।"

শান্তি। "আপনি অনুমতি করিলে যাইতে পারি।" জীবানন্দ। "আমি অনুমতি করিতেছি, কিন্তু আমার অনুমতিতে কিছুই হইবার নহে। ঠাকুরের অনুমতি লইতে হইবে।"

শান্তি। "ঠাকুরের নিকট হইতে অনুমতি, আমি লইতে পারিব।" জীবানন্দ। "বল যদি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য ধীরানন্দকে পাঠাইয়া দিই।"

শান্তি। "আমি তাঁহার সঙ্গে যাইব, তুমি তাহাতে আমার উপর সন্দেহ করিবে না?" জীবানন্দ বলিলেন। "যখন দেশের লোক তোমার উপর সন্দেহ করিল, তাতেও আমি তোমাকে ফেলিলাম না। তখন সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ

শান্তিমণি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। "তা বৈ কি!—হংস হংসীর দল।—জিতেন্দ্রিয় বলিতে লজ্জা করে না।—ভীল-সাঁওতাল তোমাদের অপেক্ষা ভাল নহে কি?" জীবানন্দ গম্ভীরস্বরে বলিলেন। "তুমি জান, জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলে?—জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের ইন্দ্রিয়, কোন বিষয়ে চঞ্চল হয় না।—আমার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী হইয়া, যদি তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে অপর পুরুষের সহিত আমোদ-প্রমোদ কর, আমি চক্ষে দেখিয়াও চঞ্চলেন্দ্রিয় হইব না।—যাহা দেখিলে সাধারণ মনুষ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে; আমাদের ধীরেন্দ্রিয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না। আমাদের ধর্ম্ম "দুষ্টের দলন, ধরিত্রীর উদ্ধার।" (পাঠক সন্তান-ধর্ম্মের সার মর্ম্মটি "দুষ্টের দলন, ধরিত্রীর উদ্ধার" কথাটি মনে রাখিবেন।—ঠাকুরের ভাঁড়ামী দেখাইব।)

শতপতি-বিলাসিনী-শান্তি গদ গদ স্বরে উত্তর করিলেন। "প্রথাটি বেশ, যদি দেশ প্রচলিত হয়।—তেত্রিশ কোটী দেবতা-দেবীর সেবা করিতে করিতে হাড় মাটি হইয়া গেল। তার উপর আবার বঙ্গবালা।—সকলে দেবী হইতে পারিলে পূজা করা কাজটা উঠে যায়।"

জীবানন্দ শান্তিমণিকে চুম্বন করিয়া বলিলেন। "হবে শান্তি, সব হবে।—হাত ছ্যাঁচড়েরা শক্তিশালী হইলে, চোর হয়; চোরেদের বল বাড়িলে, ডাকাত হয়। ডাকাতরা বাড়িয়া উঠিলেই রাজা হয়।—দেশের রাজা হইতে পারি, তবে সব হইবে। কি বল শান্তি!—বাঙ্গালীরা অত্যন্ত পতঙ্গবুদ্ধি, ওদের বুঝাইবে এক, ওরা বুঝিবে আর।—কত কৌশল করিয়া কত ফন্দী করিয়া তবে যে, বাঙ্গালীকে ধর্ম্মে আনিতে হইতেছে, তাহা আমিই জানি। তবে কোন গতিকে, যদি একবার ওদের বুদ্ধিটায় পাক লাগাইয়া দিতে পারা যায়; তবে আর যায় কোথা, কান ~~ধরিয়া যেদিকে~~ ফিরাইবে, সেই দিকেই ফিরিবে।—কম কষ্টে বিশ সহস্র সন্তানকে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি!"—এই বলিয়া মহেন্দ্রের গল্পটি শোনাইলেন। আবার বলিলেন। "এই গোলামের দলকে লইয়া, শেষে হয় তো, আমাদের সকল উদ্যমই ভাসিয়া যাইবে। মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, হয় তো মাতাকে শেষে চণ্ডালের হাতে সঁপিতে হইবে।"

মহেন্দ্রের কথা শুনিয়া শান্তিমণি প্রশ্ন করিলেন। "তুমি তো বলিলে আনন্দমঠে অনেক স্ত্রীলোক আছে, তবে মহেন্দ্রকে সস্ত্রীক সন্তান করিয়া লইলে না কেন?"

তাঁহার উপর চাল চালিতেছি।” জীবানন্দ সে রাত্রি শান্তির নিকট থাকিয়া, পরদিন আনন্দমঠে গমন করিয়াছিলেন।

জীবানন্দ চলিয়া যাইবার পর, একদিন সন্ধ্যাকালে, ধীরানন্দ শান্তিমণির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিমণি তাঁহাকে সযত্নে ঘরের মেঝেয় আনিয়া বসাইলেন। এবং অন্নাদি পাক করিয়া, সংগোপনে উভয়ে আহার করিয়া, একত্র শয়ন করিয়া রহিলেন। নিশার-গভীরে উভয়েই জাগিলেন। শান্তিমণি, শ্মশ্রুগুম্ফ-জটা-বিশিষ্ট সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া এক নবীন নাগার অনুরূপ সাজিলেন। তাহার পর ঘর-দ্বার বন্ধ করিয়া, ধীরানন্দের সহিত নিষ্ক্রান্তা হইলেন। মহাশক্তিশালিনী শান্তিমণি, পথ পর্য্যটনে ক্লান্তা হইলেন না। তাঁহারা বনে প্রবেশ করিতেই বনদেবীদের বীণাকণ্ঠ নিঃসৃত গীতধ্বনি শুনিতে লাগিলেন।—“* * * পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে যেও না।” ইত্যাদি। (বলি ঠাকুর! এই সকল বনদেবীরাও রণে হারিল, ইংরাজকে জয় করিতে পারিল না। ইহা কামুকদিগের লীলাভূমি অথবা ধর্ম্মস্থল। এই জন্যই তো এ কালের লোকেরা ঐরূপ ধর্ম্মস্থলের উপাসক সাজিয়াছে।) শান্তি ভাবিলেন। “সত্যই তো এ বনে কিন্নর রসবতী বাস করিতেছে।”

১০ * স্বদেশী গোলাগুলি। * ১০

“আনন্দমঠের ভিতর, নিভৃত কক্ষে বসিয়া, ভগ্নোৎসাহ তিনজন নায়ক সন্তান, সত্যানন্দ, জীবানন্দ এবং ভবানন্দ কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহারা মুসলমান-হস্তে কিরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন, নভেল ঠাকুর তাহা লজ্জায় প্রকাশ করেন নাই। সত্যানন্দ তাঁহাদিগকে অতি জ্যোতি বিকাশী ভাষায় উৎসাহ দান করিয়া বলিতেছেন। “আমাদের তোপ-গোলা নাই; কিন্তু আমি শীঘ্রই সে অভাব দূর করিব। মহেন্দ্রকে পাইবার জন্য যত পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে। তিনি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। তোপ-গোলা নির্ম্মাণের ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইবে। পদচিহ্ন গ্রামে কারখানা ও কেল্লা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সে দেশ এখন জনশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। মহেন্দ্র সিংহ নিজে জমিদার। কোন বিষয়ে বিঘ্ন হইবে না। আর আমি কতক দিনের জন্য তীর্থ যাত্রা করিব। গোলা-গুলি

নির্ম্মাণের শিল্পী অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ? সত্যানন্দ যাইতেছেন নন্দকুমারের সহিত দেখা করিতে, ঠাকুর আমাদের তীর্থ দেখাইতেছেন।) তোমরা দুইজনে এখানকার কর্ম্ম সকল সাবধানের সহিত পরিচালিত করিবে। কদাচ ঘোরতর ব্যাপারে লিপ্ত হইবে না। আর অন্য একটি নুতন লোক সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। তাহাকে শিক্ষা দিবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল। (ঠাকুর এখানে মেয়ে বাঁচাইয়া কাজ করিতেছেন।) আর আমি দেখিতেছি তোমাদের দুইজনকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (ঠাকুর অন্তর্যামী না কি! তাঁহাদের পাপটা কি ?)

"এইরূপ পরামর্শ দিয়া, সত্যানন্দ ঠাকুর, মহেন্দ্র সিংহের নিকট আসিলেন। এবং তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে উপদেশ দিয়া বলিলেন। "সন্তান দ্বিবিধ—দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী, তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসে এবং লুণ্ঠনের ভাগ লইয়া যায়। আর যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে দীক্ষিত সন্তান হইতে বলি। তুমি দীক্ষিত সন্তান হইলে, দেবদ্বেষী মুসলমানদের সবংশে নিপাত করিবার পন্থা পাই।" (তাই বুঝি ভারতে মুসলমান নাই! কি আকাস্পর্শী আশা। এমন আশা না দিলে পতিতজাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত করা যায় কি ?)

মহেন্দ্র সিংহ (এই বন্দেমাতরম্‌ দলের ছাত্রবৃন্দের ন্যায়, সন্ন্যাসীদের চক্রান্তে পড়িয়া একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। সকল কথাতেই তিনি) তথাস্তু বলিতে লাগিলেন। (কি কি কৌশলে, রাজলক্ষ্য লুকাইয়া, তোপ-গোলা ও বন্দুক-বারুদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে নভেল ঠাকুর, উপরে তাহারই নমুনা করিয়াছেন। এই নমুনার ভিতর যদি জেল, জরিমানা, কালাপানি ও ফাঁসী না থাকিত, তবেই তো ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিতে পারিতাম।)

"সত্যানন্দ ঠাকুর, মহেন্দ্র সিংহকে ঠাকুরঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে শান্তিমণি পুরুষ সন্ন্যাসীর বেশে বসিয়া, 'হরে মুরারে' গান করিতেছিলেন। মহেন্দ্রকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া, সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য, উভয়কে একত্র উপদেশ দিতে লাগিলেন। "তোমরা এই সাক্ষাৎ দেবীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে, সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে।—যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, গৃহ-ধর্ম্ম করিবে না।—পিতা-মাতা, ভগ্নী-ভ্রাতা, দারা-সুত, আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী, ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস সকলি ত্যাগ করিবে ?" তাঁহারা বলিলেন। "

সত্যানন্দ ঠাকুর বলিতে লাগিলেন। "ইন্দ্রিয় জয় করিবে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনও একাসনে বসিবে না। (তিনি কিন্তু পর-স্ত্রী কল্যাণীকে কোলে তুলিতেও দোষ মনে করেন না) যাহা উপার্জ্জন করিবে বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে।—স্ত্রী-কন্যা থাকে, তাঁহাদের বৈষ্ণব সেবায় উৎসর্গ করিবে। স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিবে, রণে ভঙ্গ দিবে না।—সনাতনধর্ম্ম সর্ব্বথা রক্ষা করিবে?" তাঁহারা সকল কথাতেই 'তথাস্তু' বলিলেন। তখন সত্যানন্দ বলিলেন। "তোমরা বন্দেমাতরম গাও।" অমনি উভয়ে সেই নিভৃত মন্দিরে বসিয়া মাতৃস্তোত্র গীত করিলেন। ব্রহ্মচারী তখন তাঁহাদিগকে যথা নিয়মে সন্তানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন।"

(যে সকল বোমারবীর ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের হাব-ভাব, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও জেরার সময়ে কথোপকথনাদিতে, পরিষ্কার জানা গেল যেন তাহারা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী-সন্তান। বার্ত্তাবাহী-আকারেঙ্গিত-সম্পন্ন নভেল ঠাকুর, তাঁহার মূঢ়বুদ্ধিপাঠকগণকে কিরূপ ইঙ্গিত-সঙ্কেতে গোলা-গুলী প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিতেছেন তাহা নিম্নে পাঠ করিয়া দেখুন।—

"দীক্ষা সমাপনান্তে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে, সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন। 'দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে; ইহাতে বিবেচনা করি ভগবান আমাদের প্রতি অনুকূল। তোমার দ্বারা মায়ের বৃহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।—তুমি যত্নের সহিত আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে, জীবানন্দ ভবানন্দের সহিত বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়া তোমাকে সান্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।—এক্ষণে আমাদের আশ্রয় নাই। এমন স্থান নাই যে, প্রবল সেনা আসিয়া, আমাদিগকে অবরোধ করিলে, আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বাররুদ্ধ করিয়া দশদিন নির্ব্বিঘ্নে থাকিব। (কেন, যাঁদের বনে এত বন-দেবী, তাঁদের আবার ভয় কিসের?) আমাদের গড় নাই, তোমার অট্টালিকা আছে। তোমার গ্রাম তোমার অধিকারে। আমার ইচ্ছা, সেই খানে একটি গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীর দ্বারা, পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া, মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে, উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে; তাহাদের দ্বারা গড় ও ঘাঁটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে

সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণ-পূর্ণ-সিন্দুক সকল, তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সে সকল অর্থ লইয়া এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানাস্থল হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পী সকল আনাইতেছি। শিল্পী সকল আসিলে, তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান-গোলা, বারুদ-বন্দুক (বোমা) প্রস্তুত করাইবে। এই জন্যই তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি। স্ত্রী-কন্যা-হারা মহেন্দ্র সকল কথাতেই স্বীকৃত হইলেন। (পাপিষ্ঠ সন্তানেরা, কিরূপ কৌশলজালে আবদ্ধ করিয়া নিরীহ মহেন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিল, পাঠক তাহা চিন্তা করিবেন। আর চিন্তা করিবেন, ঠাকুরের এই উপদেশ মত কার্য্য করিলে আন্দামানে ভ্রমণ করিতে হইবে কি না।)

(নভেল ঠাকুরের আবিষ্কৃত এই মহা মাদক গজনবী-গাঁজার-ধূম পান করিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থলেই বোমা-বারুদের কারখানা গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তার প্রতিফল হাতে হাতে পাইয়াছি। ঠাকুরের ১৪ খানি গজনবী গাঁজার দোকান, আমাদের জন্য যথেষ্ট হইলেও, দোকানগুলির জোর বিক্রয় দেখিয়া, আরও অনেক লোক ঐরূপ দোকান খুলিতেছেন। এ সকল চরশ-গাঁজা খাইতে ছুঁইতে হয় না, দোকান দেখিলেই নেশায় উন্মত্ত হই, স্বদেশী করিবার জন্য মনকে মাতাইয়া তুলি; কল্পনাতেই রাজ্যজয়, দেশোদ্ধার, কেল্লাদি নগর-নিচয়ের নির্ম্মাণ ও গোলা-গুলী বরুদাদি প্রস্তুত করিতে থাকি। এই দুষ্ট কল্পনা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের মাথায় প্রবল রূপে বজায় আছে বলিয়া, বর্ত্তমানেও আমরা কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমাদের যাবতীয় উদ্যম, আমাদেরই ভ্রমভরা কল্পনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। সংবাদ পত্র সকল এ বিষয়ে নীরব থাকেন কেন? ঐ গাঁজার নেশায় নহে কি?)

"মহেন্দ্র সিংহ, সত্যানন্দের পদবন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন; শান্তিমণি আসিয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন। শান্তিমণিকে তিনি প্রথম হইতেই স্বীয় কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি, শান্তির শিক্ষার ভার জীবানন্দের শিরে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইবার কথায় কথায় শান্তিকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।—চিরদুষ্টা শান্তি বলিলেন। "আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।" সত্যানন্দ তাঁহার জাল দাড়ী তুলিয়া লইলেন এবং সুমধুর-ক্রোধ দেখাইয়া বলিলেন। "তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।" যাহা হউক কন্যার কলঙ্ক লুকাইবার জন্য বলিলেন। "তোমার নাম রহিল নবীনানন্দ।—মা ভবানীর মত তোমার ললাটে

সাজিয়া, স্বামী সেবার জন্য শ্মশানে আসিয়াছ, এখানে বিস্তর ভূত-পেত্নী বাস করে। পেত্নীদের সঙ্গে তুমিও পেত্নী হইও না।"—নভেল ঠাকুর এই কথার অর্থ করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই—আন্দাজি অর্থ করিলেন কেন?—ঠাকুর প্যাঁচে পড়িলে ঐরূপ ন্যাকা সাজেন, নিজের বলা কথার অর্থ নিজেই করিতে পারেন না! এক প্রকার অপরূপ ভঙ্গিমা দেখাইতে থাকেন।

সত্যানন্দ শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন। "তুমি জীবানন্দের আবাস যাইয়া বাস করগে।" এই বলিয়া গোবর্দ্ধন নামে এক নারীসন্ন্যাসীকে ডাকিয়া, (এখানে নারী সন্ন্যাসী আছে; তবে কল্যাণীকে গ্রহণ করা হইল না কেন?) শান্তিকে তাহার সঙ্গে জীবানন্দের আবাসে যাইবার অনুমতি করিলেন। (এই পন্থায় সত্যানন্দ, সন্তান-সম্প্রদায়কে জানিতে দিলেন না যে, শান্তিমণি তাঁহার কন্যা, অথবা তিনি স্ত্রী-সন্ন্যাসী। শান্তি যদি স্ত্রী-সন্ন্যাসী বলিয়া রাষ্ট্র হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দুষ্ট সন্তান-সম্প্রদায় কিছুতেই তাঁহাকে আস্ত রাখিত না। শান্তিমণি যে সত্যানন্দের কন্যা, সে বিষয়ে বিবেচনা করি, পাঠকদের আর কোন সন্দেহ নাই। যদিও কিছু থাকে, তাহা পরবর্ত্তী কথায় ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে।—এক্ষণে, সত্যানন্দের পাঠশালাটাও সত্য হইয়া পড়িতেছে কি না?—নভেল ঠাকুর একটি প্রকৃত ডাকাতের দলকে, উজ্জ্বলাঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দেবমূর্ত্তি করিয়া দেখাইয়াছেন কি না।—এমন অবিশ্বাসযোগ্য ভ্রান্তিপ্রদ গ্রন্থ পাঠ করিলেও পাপ হয় না কি? যদি পাপ না হইবে তবে পাপের প্রতিফল সকল হাতে হাতে ফলিবে কেন?)

১১ ✻ শান্তিবনে শান্তিমণি। ✻ ১১

শান্তিমণি গোবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বনে বনে কতক পথ পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা জীবানন্দের শয়ন-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জীবানন্দ তখন তথায় ছিলেন না। গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া, পুরুষবেশা শান্তি জীবানন্দের শয্যায় শয়ন করিয়া, তাঁহার একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। (নভেল ঠাকুর এই স্থলে শান্তি জীবানন্দে একটু রঙ্গরস দেখাইয়াছেন। আমরা সেই ভ্রান্তিবিকাশী রঙ্গরস পরিত্যাগ করিয়া, এস্থলেও একটা, মস্তিষ্ক শীতলকর উশীর সৌরভ বরফ পটীর ব্যবস্থা করিলাম।)

জীবানন্দ আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যার উপর শ্মশ্রুজটায় পরিশোভিত হইয়া

শান্তিমণি শয়ন করিয়া আছেন। জীবানন্দ তাঁহার আগমনবার্ত্তা উত্তমরূপেই জানিতেন, পরন্তু তাঁহাকে চিনিতে তাঁহার কোনই ভ্রম জন্মিল না। তিনি শান্তিকে দেখিয়া বলিলেন। "একি শান্তি!"

শান্তি পুঁথি রাখিয়া জীবানন্দের মুখপানে এক প্রকার উত্তম-সম্পন্না-বিস্ময়-ভাব দেখাইয়া বলিলেন। "শান্তি কে মহাশয়! আমার নাম নবীনানন্দ!" জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন।—"মঠে, আসিয়া কি আনন্দ পাইলে যে, শান্তির বস্ত্র ছিন্ন করিয়া নবীনানন্দের বস্ত্র পরিলে?"

শান্তি। "এই বনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহা বন নহে,—চিরানন্দ জীবানন্দের নন্দন কানন। তাই আমি এই বনের নবীনানন্দ সাজিলাম।—এখানে আসিলে কেন যে সন্তানেরা গৃহসর্ব্বস্ব এবং প্রিয়বর্গকে ভুলিয়া যায়, এখন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।—এই স্থলে প্রথম প্রবেশ করিতেই, স্থানে স্থানে বনদেবীদের যে সকল নর্ত্তন-কুর্দ্দন এবং গীতবাদ্য শুনিলাম, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মিল যে, এই স্থল মায়াময় অতি সুন্দর, অতি মনোলোভা, অতি নয়নরঞ্জন, অতি চিত্তবিনোদন, এবং অতি মধুর।—এমন স্থলে প্রবেশ করিয়া যাহার জগৎ মনে থাকে, সে নরাধম অরসিক।"

জীবানন্দ। "তুমি এখনও এখানকার গভীর আনন্দের ধূম দেখ নাই।—তাহা দেখিলে হয় তো তুমি ইহাকেই নন্দনকানন মনে করিবে।" কৌতুক-প্রিয়া শান্তি তাহা দেখিবার জন্য বিকলা হইলেন। জীবানন্দ বলিলেন। "দেখাইলে তুমি আমাকে কি দিবে?" প্রেমোন্মত্তা শান্তি বিকীর্ণ নয়নে চাহিয়া উত্তর করিলেন।—"কেন আমি কি এমনই নিঃসম্বলা যে, তোমাকে দিবার জন্য আমার নিকট কিছুই নাই!"

জীবানন্দ বলিলেন। "তা বলিয়া আমি ধারে কাজ করিব না। অন্ততঃ কিছুটা তো অগ্রিম দাও!" শান্তিমণি তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিয়া অধর যুগলে দংশন করিলেন।" জীবানন্দ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বন-বিহারে গমন করিলেন। নানা স্থানে, লতা-বিতান মধ্যে বহুবিধ দেবতা-দেবীর উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিলেন। প্রত্যেক স্থলে নূতন লীলা, নূতন রসিকতা নূতন অভিনয়। প্রত্যেক স্থলেই দেবতা দেবীরা সুর-লীলায়, নির্লজ্জ ও বিভোর, অপূর্ব্বকৌশলসম্পন্নমল্লযুদ্ধচ্ছলে মদনদেবকে সার্কাস দেখাইতেছে।—জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া গোপনে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। শান্তি বলিলেন। "এই সকল রমণীকে লইয়া সন্তানদের মধ্যে বিবাদ হওয়া তো

গোল নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তোমাকে দেখাইয়া আনি। অনন্তর তাঁহারা জ্ঞানানন্দের মাঠে যাইয়া, প্রকাশ্যভাবে জ্ঞানানন্দের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানানন্দ নবীনানন্দকে পুরুষ বলিয়া জানিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কি ভাগ্যধর হইবে?" শান্তি বুঝিতে পারিলেন না, জীবানন্দ বলিলেন। "না উনি ভাগ্যধর হইবেন না। কি করিয়া সন্তানেরা ভাগ্যধর হয়, তাহাই দেখিতে আসিয়াছেন।" জ্ঞানানন্দের উত্তর দিকে প্রায় ৫০০ শত নারী এবং দক্ষিণ দিকে সম পরিমাণ পুরুষ। তাহাদের নয়ন বস্ত্রাবৃত। তিনি একে একে পুরুষদিগকে ছাড়িতে লাগিলেন। তাহারা অন্ধের ন্যায় সুন্দরীদল-মধ্যে যাইয়া, এক এক জন এক এক রমণীর হাত ধরিয়া 'আমার ভাগ্য' বলিয়া নয়ন খুলিয়া তাহাকে লইয়া লতা-বিতান ভূমে গমন করিতে লাগিল। শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই লীলা দেখিয়া, জীবানন্দের সহিত গৃহে ফিরিলেন। পথে আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন। "এই সকল অলৌকিক রূপবতীদিগকে কেমন করিয়া পাইলে?" জীবানন্দ বলিলেন। ঐ সকল আমাদের ডাকাতি করা ধন। আমরা কুৎসিতা নারী বা দুর্ব্বল পুরুষকে সন্তান করি না।—ধীরানন্দ তোমাকে সন্তান করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে তিরস্কার করায় সে তোমাকে আবার বাড়ীতে রাখিয়া আসে।—আমি বুঝিলাম, মা তোমাকে ঘরে স্থান দিবে না, তাই তোমাকে নিমাইয়ের নিকট রাখিয়া আসি।—তুমি আবার আসিয়াছ। ঠাকুর অগত্যা তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তোমার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা এই যে, তোমাকে পুরুষবেশে থাকিতে হইবে। কেহ তোমাকে রমণী বলিয়া চিনিতে না পারে।

১২ ❋ কটিবলে শত্রুজয়। ❋ ১২

"১৭৭২ অব্দে, দেশে বৃষ্টি হইল, শস্য জন্মিল। দুর্ভিক্ষ অপসারিত হইয়া গেল। কিন্তু অনেক আবাসই, জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্তান-সম্প্রদায় গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তাহারা বন্দুক-পিস্তলাদি আগ্রহের সহিত লুণ্ঠন করিত। তাহাদের যত কিছু আক্রোশ মুসলমানদিগের প্রতি। গ্রামবাসীদিগকে লুণ্ঠনের ভাগ দিয়া, ক্রমশঃ বশীভূত করিয়া লইয়া মুসলমানদের আবাস সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে, গৃহ সকল পোড়াইয়া দিতে ও তাহাদিগকে

ভুক্ত (নির্ঝরতীরে জলপান করিতে করিতে নিম্ন হইতে উপরের জল ঘোলা করিবার অপরাধে এবং তাহার জন্মিবার পূর্ব্বে গালাগালি করিয়াছিল বলিয়া, নেকড়ে বাঘ তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই উপদেশটী, নভেল ঠাকুরের উপদেশের নিকট স্থান পাইল না। মুসল্‌মানেরা রাজ-সম্প্রদায়গত হইবার অপরাধে, ন্যায়পরায়ণ সন্তানেরা তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল।—ঠাকুর কি আদালতে বসিয়া ঐরূপ বিচারই করিতেন!—মুসলমানদের উপর ঠাকুরের এতাধিক রাগ হইবার কারণ আমরা পরে দেখাইব। এবং দেখিবেন যে, সে রাগও ঠাকুরের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত রাগ বই আর কিছুই নহে।) সন্তানেরা স্ত্রী-কন্যা অপহরণ করিয়া, ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া, আনন্দমঠ বোঝাই করিয়া ফেলিল।—গ্রামবাসীরা কেহ বা রমণীর লালসায়, কেহ বা ধনের লালসায়, আর কেহ বা পেটের জ্বালায় অবাধে সন্তান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন শত সহস্র জন সন্তান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে থাকিলে, স্থানীয় রাজপুরুষেরাও সন্তান-সম্প্রদায়কে সেনা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। (দুঃখের বিষয় বোমা বাহিনীরা রাজসেনার সাহায্য পাইলেন না। ঠাকুরের কুহক-মন্ত্রে তদীয় পতিতবুদ্ধি পাঠকেরা যেমন মন্ত্রমুগ্ধ, দেশের রাজন্যবর্গ তেমন হইলেন না!)

"সন্তানদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারে গ্রাম কম্পবান, দেশ কম্পবান, পথ-ঘাট কম্পবান হইয়া উঠিল। পথে লোক চলা ভার, সরকারী খাজনা যাওয়া ভার, সওদাগরী মাল যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। ইংরেজ কিছুতেই এই দুষ্ট দলকে আঁটিতে পারিল না। দেশ অরাজক হইয়া গেল।

"এই সময়ে সেই ইতিহাস পরিচিত মহাপুরুষ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, ভারতবর্ষের গর্ভনর্ জেনারেল পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি কাপ্তেন টমাস্‌কে একদল সেনা দিয়া বিদ্রোহ-দলনে প্রেরণ করিলেন। কাপ্তেন টমাস্ বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে সৈন্য রাখিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্তান-সম্প্রদায়কে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সেই সময়ে শিবগ্রামে একটি রেশমের কুঠী ছিল, কুঠীয়াল সাহেবের নাম 'ডানিওয়ার্থ'। সন্তানেরা সপত্নীক ডানিওয়ার্থের উপর নানা প্রকার পীড়ন করিতে লাগিল। টামস্ সাহেব, অনেক সেনা ও রসদাদি লইয়া, ডানিওয়ার্থের সাহায্যের নিমিত্ত গমন করিলেন। পথিমধ্যে কতকগুলি আনাড়ি লুঠিয়াল তাহাদের রসদ লুণ্ঠন করিতে ধাবিত হয়। তাহাতে টমাস্ সাহেব তাহাদের সাতজন মাত্রকে বন্দী

কলিকাতায় সংবাদ করিলেন যে, "১৭৫ জন সেনা লইয়া আমি ১৪৭০০ বিদ্রোহীকে পরাভূত করিয়াছি। ২১৫৩ জন প্রাণে মারা গিয়াছে, ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে, এবং বাকি ৭ জন আমাদের বন্দীখানায় আছে।"

(নভেল ঠাকুর এই রিপোর্ট মিথ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা ছাত্রগণকে আকারেঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন যে, ইংরাজেরা কথায় বীর, মহরমের গোঁওরঙ্গের মত কাগজের ঠাটে খাড়া আছে, সাহস করিয়া এক যোগে দাঁড়াইতে পারিলে, উহারা পাখার বাতাসে উড়িয়া যাইবে। ইতিহাসে উহাদের যে সকল বীরত্বের কথা পড়িয়াছ, এই রিপোর্টের মত সে সমুদয় কথা বাতিল ও নামঞ্জুর। এই জন্যই ইংরাজেরা যে কিরূপ শক্তিশালী-সম্প্রদায়, পাঠকেরা তাহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে কতকগুলি লোক একত্র হইয়া আনন্দমঠের অনুকরণে দাঁড়াইতে পারিলেই, পলকের মধ্যে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তবে সে বারে যেমন রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজকে ফেরত দেওয়া হইয়াছিল, এবারে তাহা করিব না।)

একদিন টমাস্ সাহেব, ডানিওয়ার্থের সহিত মিলিত হইয়া শীকার করিবার ভাণে আনন্দবনে প্রবেশ করেন। শান্তিমণি সন্ন্যাসীর বেশে এক বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। শান্তিকে দেখিয়া সাহেব মনে করিলেন, এই বনে সন্ন্যাসী-দস্যুরা নিশ্চয়ই বাস করে। কৌশলী শান্তি সমগ্র সন্তান-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়া লইবার মানসে, স্বীয় হৃদয় বস্ত্র খুলিয়া দেখাইলেন। 'আমি স্ত্রীলোক। এ বনে পুরুষ মাত্র নাই।' এই বলিয়া সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার মনোহর নয়নের অভ্রান্ত অস্ত্র হানিলেন। সাহেব অমনি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুইজনে সেই নির্জ্জন বনে কতক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিবার পর, সাহেব তাঁহাকে পাঁচ টাকা বক্সিস্ করিতে চাহিলেন। শান্তি বলিলেন। "টাকা লইয়া কি করিব, তোমার বন্দুকটি আমায় দাও, আমার নিকট বন্দুক থাকিলে, আমি আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিব। এখন আমি তোমার স্ত্রী, একটা বন্দুক দিয়া আমাকে রক্ষা করিবে না?" সাহেব হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে বন্দুকটি দান করিলেন, এবং শান্তিকে আবার চুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাহেব চলিয়া গেলে শান্তি বন্দুক লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। "আজ আমি আমার যৌবনের কল্যাণে, সন্তানদিগের দুইটি উপকার করিয়াছি। টমাস্ সাহেবকে বন হইতে তাড়াইয়াছি। আর সন্তান-সম্প্রদায়ের অতি প্রয়োজনীয় অস্ত্র, একটি বন্দুক লাভ করিয়াছি। কিন্তু এই বিলাতী মার্কা মারা বন্দুক লইয়া সন্তানদিগকে

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শান্তি সেই বন্দুকটি দেবমন্দিরের এক স্থলে লুকাইয়া রাখিলেন। এবং সেই সময়ের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।)

(নভেল ঠাকুর লজ্জার খাতিরে, উক্ত কথাটি লুকাইয়া শান্তির মহা-বীরত্ব দেখাইয়াছেন।—শান্তি তাঁহার বাহুবলে সাহেবের বন্দুক কাড়িয়া লইল, সাহেব আর্শিদৃষ্ট বানরের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তি দয়া করিয়া বন্দুকটি সাহেবকে ফিরাইয়া দিল।—বলি ঠাকুর, শান্তি এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিল না কেন? আর যুদ্ধের সময় সত্যানন্দ যে বন্দুকটি বাহির করিয়া বলেন, 'ইহা বৈকুণ্ঠের বন্দুক।' সেটি কি সত্যসত্যই বৈকুণ্ঠের বন্দুক, অথবা শান্তির এইটি? যদি বৈকুণ্ঠের বন্দুকেও জয়লাভ করিতে না পার, তবে আর আশা কোথা! বৈকুণ্ঠ বিজয়ী ইংরাজের উপর কে জয়লাভ করিতে পারিবে?—ঠাকুর এখানে বৈকুণ্ঠের মর্য্যাদা ভ্রষ্ট করেন নাই কি?—পাঠকদের মাথায় স্থায়ী বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার মানসে, ঠাকুর এই গ্রন্থে বৈকুণ্ঠনাথ এবং বৈকুণ্ঠের বন্দুকাদি দেখাইয়া তাহাদিগকে উদ্ভ্রান্ত করিয়াছেন। পাঠকেরাও এক এক জন এক এক 'শায়েস্তা খাঁন।' তাহারা ভাবিল, 'জন সাধারণকে যত উদ্ভ্রান্ত করিতে পারিব, আমাদের গুণগ্রামও তত বৃদ্ধি পাইবে।' তাই এ কালে ঠক বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় হয়।—কোন কোন লেখকও ঠাকুরের দৃষ্টান্তে, এই মনে করিয়া গ্রন্থ লেখেন যে, যদি তিনি সাহিত্য-সম্রাট নাও হইতে পারেন, সাহিত্য মন্ত্রী, সেনাপতি, পুলিষ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা কনষ্টেবল তো হইতে পারিবেন।—আমরা বাঙ্গালীর রুচি দেখিয়া অবাক!)

সন্তান-সম্প্রদায়, মহেন্দ্রকে পদচিহ্ন গ্রামে তোপ-গোলার কারখানায় নিযুক্ত করিয়া দিয়া, তাঁহার স্ত্রী কল্যাণীর সৎকার করিতে লাগিলেন। কল্যাণী এখন ভবানন্দের ঠানদিদির নিকট নগরে বাস করিতেছেন। পীরপ্রবর সত্যানন্দ ঠাকুর কল্যাণীর শয়ন মন্দির হইতে নির্গত হইয়া, ধীরানন্দকে দ্বারদেশে দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে কল্যাণীর সহিত আলাপ করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। ধীরানন্দ কল্যাণীর আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া যাইবার পর, ভবানন্দ আসিলেন। কল্যাণী সন্তান-ধর্ম্মে আস্থা ভ্রষ্টা হইয়া, সত্যানন্দ এবং ধীরানন্দের কথা ভবানন্দকে বলিয়া দিলেন। ভবানন্দ ক্ষুন্নমনে ফিরিয়া গেলেন, এবং ধীরানন্দের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিলেন। তিনি একাকী বনে প্রবেশ করিয়া ধীরানন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে তরবারি বসাইয়া দিলেন। ধীরানন্দ আপনাকে দোষী জানিয়া আঘাত খাইয়া পলায়ন করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে কল্যাণী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে বহু বিলাসিনী হইয়া থাকিতে হইবে। তিনি মহেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যে কি মহা ঝকমারী করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। পরন্তু তিনি নিয়ত রাত্রিকালে, ভবানন্দকে দেশোদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। এবং যুদ্ধের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, তিনি যুদ্ধে অগ্রগামী হইবেন।—কল্যাণীর উদ্দেশ্য এই যে, ভবানন্দ যদি যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে, তবে তিনি তাঁহারই হইবেন।

(নভেল ঠাকুর পাঠকদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য, যে সকল কথায় উপরোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।—ভবানন্দ ধীরানন্দকে কেন আঘাত করিল ? ঠাকুর বলেন,—ধীরানন্দ ভবানন্দকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সন্তান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এস আমরা সংসারী হই। ভবানন্দ কি কাম-দেবের বশীভূত হন নাই যে, তায় তাঁহার এত রাগ জন্মিল ?—ঠাকুর তাঁহার পাঠকদিগকে যা মনে আসিতেছে, তাই বলিয়া বুঝাইতেছেন।—আর পাঠকেরা পাঠ করিতে করিতে এমন 'হক্কা-বক্কা-উচ্চক্কা' হইয়া পড়িতেছে যে, টাকাকে "ফক্কা" আর ফক্কাকে "টাকা" বুঝিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না।—শরবৎ বলিয়া অশ্বমূত্র পান করিয়া চলিয়াছেন। বিবশ রসনায় অনুভব শক্তিও নাই।

১৩ ❀ বৈকুণ্ঠের বন্দুক ❀ ১৩

"তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, একদিন সত্যানন্দ ঠাকুর, সেই আনন্দ বনের অন্তর্গত নির্ঝর তীরে এক মহা সভা নির্ম্মাণ করিলেন। স্ত্রী এবং পুরুষ, সকল সন্তানই পুরুষবেশে সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যানন্দ কেন তীর্থে গিয়াছিলেন এবং কি কি মহাকার্য্য করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণন করিলেন। সন্তানেরা শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িল। তাহাদের মাথা গরম হইয়া উঠিল, মনে করিল। 'আমরা তবে কি হইলাম।' কাল্পনিক খেয়ালে নাচিতে আরম্ভ করিল। (ঠাকুর বলিতেছেন) "কেহ চীৎকার করিতে লাগিল। "মার মার নেড়ে মার !" কেহ বলিল "জয় মহারাজ কি জয়।" কেহ গাহিল। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" কেহ গাহিল 'বন্দেমাতরম্।' কেহ বলিল।—'ভাই, এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ বাঙ্গালী হইয়া, রণক্ষেত্রে এ শরীর পাত করিব।

জন্য ইশারা করিতেছেন। কিন্তু কেহই বুঝিল না যে, বিড়াল-কুকুর রণে মরিলে দেশোদ্ধার হয় না।) কেহ বলিল 'এমন দিন কি হইবে, মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া রাধা-মাধবের মন্দির গড়িব। (উহঃ বীরগণের কি আকাশস্পর্শী আশা!—ক্ষুদ্র মাথায় এত বড় আশা প্রবেশ করিলে সে মাথা ফুটিফাটা হয়।— হইতেছেও তাই।) কেহ বলে 'ভাই এমন দিন কি হইবে যে, আপনার ধন আপনি খাইব। (কেহ ভাবিল না যে, যে ব্যক্তি পাঁচজনকে দিয়া খান, ঈশ্বর তাঁহাকেই দিয়া থাকেন; আর যে নরাধম কেবল আপনার পেট পুরিতে চায়, তার মুখে নাথি আর ঝাঁটা পড়ে।)

"সেই দশ-সহস্র আনন্দোৎফুল্ল সন্তানদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সত্যানন্দ ঠাকুর দুই হাত তুলিয়া বীর্য্যবিকাশীভাষায় সন্তান-দলকে সাহস দান করিতে লাগিলেন। সন্তানেরা আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এক-তান-মনে গান করিতে লাগিল। 'জয় জগদীশ হরে।' গান সমাপ্ত হইলে সত্যানন্দ বলিলেন। "বেলা চারি দণ্ড হইলেই পদচিহ্নের দুর্গ হইতে, ১৭ খানি কামান এখানে আসিয়া পড়িবে।—আর আমাদের আঁটে কে?—"

এমন সময়ে 'গুড়ুম্ গুড়ুম্' শব্দে ইংরেজদের কামান গর্জ্জিতে লাগিল।—জীবানন্দ তরুশিরে আরোহণ করিয়া দেখিলেন। 'অশ্বারোহী, পদাতিক, গোরা ও কালা অগণিত সৈন্য বনের দিকে আসিতেছে। সত্যানন্দের আদেশে জীবানন্দ সেই দশ হাজার সন্তানের সেনাপতি হইলেন।—সকলেই মহোৎসাহে গান করিতে লাগিলেন।—'জয় জগদীশ হরে। ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।'

শক্তিশালিনী শান্তিমণি, নবীনানন্দের বেশে পর্ব্বতের উপর হইতে বলিলেন। "একটি ক্ষুদ্র মাঠের পারে শত্রু সেনা!" সত্যানন্দ ঠাকুর (টমাস সাহেবের সেই বন্দুকটি জীবানন্দের হাতে দিয়া) সকলকে অভয়দান করিয়া বলিলেন। "গত রাত্রে দেবী বৈকুণ্ঠ-ধামে যাইয়া এই বন্দুক আনিয়াছেন। চিন্তা নাই, আমাদের জয় হইবে।—তোমরা শত্রুদের তোপ কাড়িয়া লইবে।" (নভেল ঠাকুর এখানে কেমন সুন্দরভাবে বার্ত্তাবাহী-বিকীর্ণ নয়নে চাহিয়া, সন্তান-সম্প্রদায়ের বেনামে স্বীয় পাঠকদিগকে, ইংরাজ বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও উদ্ধত করিয়াছেন দেখুন!)

"জীবানন্দ দশ সহস্র সোৎক্রোশিত সৈন্য লইয়া ঘোর রোলে 'জয় জগদীশ হরে' গাহিতে গাহিতে, ইংরেজদের তোপ কাড়িবার উদ্দেশে, বন হইতে নির্গত হইলেন। ধীরানন্দ ভবানন্দ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা প্রায়, দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে কালসমরে

পাতিয়া দশ সহস্র সেনা, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হইয়া যেন পবন তাড়নে ছুটিলেন। গোলার অবিশ্রান্ত প্রপাতে রাশি রাশি সন্তানেরা পতন হইতে লাগিল হস্ত, পদ, মস্তক উড়িয়া যাইতে লাগিল, মৃত সন্তানেরা জীবন্তদের গতিরোধ করিতে লাগিল; তথাপি সেই জননী জন্মভূমির চরণে উৎসর্গিত সন্তানদল, পশ্চাৎপদ হইল না। (আমরাও " বন্দেমাতরম্ " বলিয়া বীর সাজিয়াছিলাম, তাহাতে আমরাও দেশোদ্ধার করিলাম। তোমরা এখন এ কথা অস্বীকার করিতেছ, কর; শতবৎসর পূরে আমাদের এই বীরত্ব বাঙ্গালী লেখকদের মুখে নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে।)

"তোপের মুখে সন্তানগণ খই-ছড়ান হইতে থাকিলে, ভবানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন। "সর্ব্বনাশ হইতেছে।—আমাদের বনে ফেরাই উচিত।" জীবানন্দ বলিলেন। "ফিরিতে গেলে, কেহই ফিরিবে না। ঠাকুরের আদেশমত তোপ কাড়াই কর্ত্তব্য।" (এমন বীর্য্যবাহী ইঞ্জেক্সানেও এ কালের ভীরু সন্তানেরা তোপ কাড়িবার দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। কাণ-মন্ত্র দিলে কাপুরুষেরা কি বীর হইতে পারে, না লেখা-পড়া শিখিলে ছাগল-ঘোড়া হয় ?)

কল্যাণীর আদেশে ভবানন্দকে বাহিনীর অগ্রভাগে থাকিতে হইবে, তাই ভবানন্দ বলিলেন। "তবে তুমি পশ্চাৎ হও, আমি অগ্রে থাকি, মরিতে হয়, আমিই মরিব।" জীবানন্দ বলিলেন। "না আমি অগ্রে মরিব।" (এই বলিয়া বাঙ্গালী বীরদ্বয় মরণ কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন। ইংরেজ তুমি সাবধান হও; ঠাকুরের এই বজ্রাগ্নি-বাহী-বাক্য কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। স্বদেশী হুজুগেও আমরা মরণ কাড়াকাড়ি করিতে ছাড়ি নাই, আর ছাড়িবও না, ঠাকুর আমাদের মৃত্যুঞ্জয় করিয়া গিয়াছেন। আমরা আর কাপুরুষ নহি।)

"সেই সেনাক্ষয়ী কাল-রণ হইতে রক্ষা পাইবার মানসে, অবশেষে ভবানন্দের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জীবানন্দ, অধিক পরিমাণ সেনা লইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। এবং নিকটবর্ত্তী নদীর পোল পার হইয়া পলায়নেচ্ছা করিলেন।"

১৪ * ঘোড়ায় বাঁধা বন্দী * ১৪

"কাপ্তেন টমাস জীবানন্দের মানস বুঝিতে পারিয়া, কতক সেনা লইয়া লেফ্‌টেন্যান্ট ওয়াটস্‌কে, জীবানন্দের বামপার্শ্বে ধাবিত করাইলেন, এবং কাপ্তেন

করিলেন। তখন ভবানন্দ তাহাদের উপর শার্দ্দূলবলে নিপতিত হইয়া, কাপ্তেন টমাসের তৈলঙ্গী সেনাদল নিঃশেষ করিয়া দিলেন। (আর লেফ্‌টন্যাণ্ট ওয়াটসন্ এবং হে সাহেব কি বানরের মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন? ঠাকুরের জালিয়তী কি চমৎকার! এই জালিয়তী ধরিতে পারি নাই বলিয়াই, আমরা ঠাকুরের রামছাগল।) সন্তান-সেনার অসিপুঞ্জ যেন কচু-কুঞ্জে ঘুরিতে লাগিল। পলকের মধ্যে কাপ্তেন টমাস্ বন্দী হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে অশ্বের উপর বাঁধিয়া রাখা হইল। (এর নাম ঘোড়ায় বাঁধা বন্দী, এরূপ বন্দী ঘোড়াসহ পলাইতে পারে না। এইরূপ পতিতবুদ্ধিগত চিত্রটি, পতিতবুদ্ধিগত ব্যক্তিকেই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া থাকে।)

(এখানে নভেল ঠাকুর তাঁহার সংবাদ-বিভাষী আকার-প্রকারে, ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।—'ঐ দেখ পাঠশালার ছেলেরা, ইংরেজযুদ্ধে জয়ী হইল, তোমরা কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্র, তোমরা ঐরূপ অটল উদ্যমের সহিত দাঁড়াইলে, দেখিবে ইংরেজ অতিথি কিছুতেই আমাদের দ্বারে তিষ্ঠিতে পারিবে না। তোমাদের বল, বীর্য্য, বুদ্ধি, জ্ঞান সকলই আছে; নাই কেবল সাহস।—অধ্যাপক মহাশয় শিক্ষা দিন,—সাহস বাজারে বিক্রয় হয় না, সাবাসী দিন, সাবাসী দিলেই সাহস বাড়িবে, ভীরুরাও মহাবীর হইয়া দাঁড়াইবে।')

সেদিকে পোলের নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবানন্দের দশা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি প্রতি পার্শ্ব হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা তোপের মুখে পড়িয়া যেন, দুই হাতের ঝাঁটায় ঝাঁটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ভবানন্দ কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিয়া লইয়া তৎপর আসিয়া জীবানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। এবং তিনজনে মিলিয়া ইংরেজদের একটা কামান কাড়িয়া লইলেন। (এস বোমা ভাই! এইখানে একবার 'বন্দেমাতরম্' বলি! এমন দিন কি হবে?)

তোপ কাড়িয়া লইবার পর, ভবানন্দ ২০ জন মাত্র সন্তান-সেনা নিজের নিকট রাখিয়া, বাকি সকলকে আনন্দমঠে যাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবার আদেশ করিলেন।—এবং তখন তিনি সেই তোপের মুখ ঘুরাইয়া লইয়া 'দম্যাদম্' ফায়ার করিতে লাগিলেন। যবনেরা যেমন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হইয়া আসিতে লাগিল, অমনি সেই পর্ব্বতাকৃতি গোলা চাপা পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। ২০ জন মাত্র সন্তান, পোলের মুখ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া একটি মাত্র তোপের সাহায্যে, তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী ও ইংরেজ সেনাদলকে, কদলীবৃক্ষের ন্যায় একসা শোওয়াইয়া দিলেন। গম্ভীর

আর কোনই বাজে দেখিল না।—(বোধকরি বৈকুণ্ঠের বন্দুক দেখিয়া তোপ-গোলা সকল বেহুঁস হইয়া থাকিবে, এতক্ষণ কাজে দেখিল আর এখন কাজে দেখে না কেন? যাহারা এরূপ আদাড়ে কল্পনার উপাসক, তাহারাই কি দেশোদ্ধার করিবে?) শত্রুরা দলে দলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।—কেবল ইংরেজেরা, (আমাদের রাজা তাই বীরবাচ্চা), তাঁহারা রণেভঙ্গ না দিয়া বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিলেন। (ঠাকুর বলিতেছেন "খাড়া দাঁড়াইয়া"—ঠাকুর আবার ওস্মানকে বিদ্রূপ করেন।) এই সময় পদচিহ্ন হইতে ১৭ খানি কামান আসিয়া পড়িল। আর যায় কোথা—সন্তানেরা নূতন উদ্যম সহ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, অভ্রান্ত-লক্ষ্য ও ক্ষিপ্রহস্ত হইয়া, পূর্ব্বপ্রাপ্তির প্রতিদান করিতে লাগিল।—'হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছুই টিকিল না। বল-বীর্য্য, সাহস-কৌশল, শিক্ষা-দম্ভ, সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজ, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। (এখানে ঠাকুরের ভাবাটাও, হিন্দু-বন্দুকের মুখে পড়িয়া 'বাঙ্গালার' স্থলে একচালা হইয়া গেল।—ঠাকুর এখানে কপোল-কল্পিত সাম্প্রদায়িক-আনন্দের জোষে আসিয়া—'আমরা তবে কি হইনু, মানুষ রহিলাম কি বীর হনুমান হইয়া গেলাম' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে,—গোরা, বিলাতী, ইংরেজী, বাদশাহী, তার উপর নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী করিয়া, ভাবাটাকে তাঁহারই মাদক দোকানের চাট করিয়া তুলিয়াছেন। যে জাতি সমরের কিছুই জানে না, সে যদি রণচিত্র অঙ্কন করে, তাহার সে চিত্র এইরূপ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে এবং যে জাতি দেশভ্রমণে ভগ্নপদ, তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে মানুষও গাধা হইয়া যায়। হিন্দুদের গ্রন্থ পড়িয়া মুসল্‌মানেরাও গাধা হইতেছে।)

"ইংরেজ 'ঘাবরাইয়া' গেল, সন্তানদের নিকট বন্দী হইতে স্বীকার করিল। (বন্দী করিলে পাছে ইতিহাসে বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রকাশ পায়, সেই মহা-মারাত্মক আশঙ্কায়) ভবানন্দ তাহাদের কোন কাতরতা শ্রবণ করিলেন না। তিনি 'মার মার' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ভবানন্দ কল্যাণীর নিকট যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (ঠাকুর তাঁহার সম্রাটী বুদ্ধিতে দেখাইয়াছেন, কল্যাণীর প্রেমে নিরাশ হইয়া ভবানন্দ এই যুদ্ধে জীবনপাত করিতে আসিয়াছেন।) যখন তিনি ইংরেজদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহারা ২০।৩০ জন গোরা একত্র হইয়া ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বলিতে তিনিও সমরশায়ী হইলেন। (পাছে দুষ্ট ঐতিহাসিকদের ঠেকাঠেকির হাতে পড়িতে হয়, সেই ভয়ে, নভেল ঠাকুর কাপ্তেন টমাস্ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন।) "টমাস্ এক আইরিস-ম্যানকে হুকুম দিলেন, তিনি টমাসের বন্দী হওয়া অপেক্ষা মরণ ভাল মনে করিয়া, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। (আমরা বলি, ভবানন্দ যেমন কল্যাণীর জন্য মরিলেন। হয়তো টমাস্ সাহেব তেমনি শান্তি শান্তি বলিয়া, মরণ কামনা করিলেন। নচেৎ যে বন্দী, সে আইরিস-ম্যানকে হুকুম দিতে পারে কি? একেই বলে পতিত কল্পনাগত রণবিদ্যা। এই বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া আমরা সকল স্থলেই ঠকিতেছি, তথাপি নিজের বড়াই ছাড়ি না।)

১৫ ❋ বাঙ্গালীর রাজ্যজয় ❋ ১৫

এইরূপ কল্পনায় রণজয় করিবার পর সন্তানগণ সত্যানন্দকে ঘেরিয়া, অজয়-তীরে আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সত্যানন্দ ঠাকুর ভবানন্দের জন্য নিরানন্দ হইয়া রহিলেন। যুদ্ধের সময় সন্তানদলের বাদ্য বাজে নাই। এই বার, কাড়া, নাগরা, দামামা, ঢোল, কাঁসি, সানাই, তুরী, ভেরী, রামশিঙাদি বাজিতে লাগিল। সকল দিকেই জয় হইল, সেই আনন্দে সকলেই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। কেহ এমন মনে করিবেন না যে, সন্তানেরা রাজ্য জয় করিতে পারিল কই!—মায়ের উদ্ধার করিতে পারিল কই!—জয়ী হইল, তবে রাজা হইল কই!—তোমরা জান না, এইরূপ রাজ্য কল্পনায় হয়, কল্পনায় লয়!—সন্তানেরা মায়ের উদ্ধার করিয়া, আবার স্বেচ্ছায় তাঁহাকে কারাবরুদ্ধ করিলেন! কেন তার খবর রাখ কি?—ও মেয়েটির একটা রীত বড়ই খারাপ।—ওকে যাহারা উদ্ধার করে, তাহারা মরিলে, ও মেয়েটী তাদের গোর দিয়া আপন গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয়। পাছে বাঙ্গালীকে চিতায় না পোড়াইয়া, ধরিয়া আপন গর্ভে গোর দেয়; তাই সন্তানেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করিয়া আবার বন্দিনী করিল।—আর মেয়েটিও পাঁচ-পাত চাঁটা নেয়ে, ওঁকে বাড়ীতেও স্থান দিতে নাই।—সন্তানেরা ভবানন্দের সৎকার কার্য্যটা, বোমা-বীরদের সৎকারের ন্যায় অতিশয় জাঁক-জমকের সহিত করিয়াছিল। (বোধকরি সন্তানদের অনুকরণে বোমা-বীরেরা করিয়া থাকিবে।) সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে বলিলেন। "তুমি আর কেন কষ্ট পাও, তোমার স্ত্রী-কন্যা লইয়া তুমি সুখে বাস করগে—(তবে যে ঠাকুর

মিলিয়া করে?) আমরা জয়ী হইয়াছি, রাজ্য আমাদের হইয়াছে। বরেন্দ্র-ভূমি এখন বাঙ্গালীর রাজ্য হইল। তোমরা সন্তান রাজ্য প্রচার করিতে থাক।" এইরূপ শুনিয়া সন্তানেরা আনন্দে দিশাহারা হইয়া লুণ্ঠন করিতে চলিয়া গেল। (আক্কেল কি! কাপ্তেন টমাসের অপঘাতে মৃত্যু হইবার কারণে, সন্তানেরা মনে করিল "ইংরেজদের সত্যানন্দ ঠাকুর মারা গিয়াছে, কাজেই ওদের দলটা এইবার নাকখাঁ হইয়া গেল।—তবে আর কি, আমরা এই দেশের রাজা হইলাম।—তাহাদের আনন্দ করিবার আর একটা মূল কারণ এইরূপ ছিল—"ইংরেজেরা এত দম্ভ, এত তোপ-গোলা লইয়া তো আসিল, কই আমাদের সকলকে তো মারিতে পারিল না। তবে ওদের উত্তম সফল হইল কই।—তবে তো আমরাই জয়ী হইলাম।"—এইরূপ পতিতবুদ্ধি মতে সন্তানদের জয়, দুই প্রকারে প্রমাণ হইয়া পড়িলে তাহারা আনন্দে দিশাহারা হইয়া পড়িল। এই যুদ্ধে বিস্তর স্ত্রী-সন্তানও যোগ দিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া, অনেক তৈলঙ্গী ও মুসল্‌মান সেনা সরিয়া পড়ে। নভেল ঠাকুর সেই সরিয়া পড়াকে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, বলিয়া উল্লেখ করিয়া পাঠকদলকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছেন। সন্তানদের স্ত্রাসেনা থাকা কথাটা ইংরেজরা জানিত, সেই কারণেই সেই মাতাল সাহেব বলিয়াছিল, 'সালাকো পাকাড়কে সাদী কর।'—সন্তানেরা বনের ভিতর পলায়ন করিয়া সে যাত্রা ইংরেজদের হাত হইতে আংশিকরূপে বাঁচিয়া গিয়াছিল। এই কালরণে সন্তানেরা যে ভাবে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, ঠাকুর এখানে তাহা উদরস্থ করিলেও, ইহার পর উদ্গীরণ করিয়াছেন।)

রাজ্য জয় করিলে লুণ্ঠন করিতে হয় ইহা ইতিহাসে পড়া কথা। তাই ঠাকুর বরেন্দ্র-ভূমি লুণ্ঠন করিতে অনুমতি করিলেন। আর বিজিত রাজ্যটা আমরা দেখিতে না পাই, ঠাকুর তাহা কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার পাঠকদিগকে মাহাতাব সরকারের মেড়া মনে করিয়াছেন কি না, ভাবিয়া দেখিবেন কি?)

সন্তানেরা, সত্যানন্দকে মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। সেই অনুকরণে আমরাও মহাত্মা গান্ধিকে মহারাজা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। মহারাজা উত্তমরূপেই জানিতেন যে, তিনি সন্তানবর্গকে বাঁদর-বুঝান করিতেছেন, তিনি বলিলেন—"ছি! আমাকে কি শূন্যকুম্ভ মনে কর।—আমরা কেহই রাজা নই। রাজা তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠ নাথ। (পাঠক শুনুন। বৈকুণ্ঠ নাথ, বঙ্গরাজ্য হারাইয়া কাঁদিতেছিলেন, তাই সত্যানন্দ রাজ্যটি জয় করিয়া তাঁহাকে দিলেন। এখানে

মহেন্দ্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমার স্ত্রী-কন্যা কোথায় ?" (ভবানন্দ মরিয়া গিয়াছেন তখন আর কল্যাণীকে কাহার জন্য লুকাইয়া রাখিবেন, যাহার ধন তাহাকেই দেওয়া উত্তম বিবেচনা করিয়া) ঠাকুর বলিলেন। "কল্যাণী বাঁচিয়া আছে।—তুমি বাড়ী যাও সেইখানে তোমার স্ত্রী-কন্যাকে পাইবে।" এই বলিয়া পুরুষ-বেশা শান্তিমণিকে অনুমতি করিলেন। "তুমি মহেন্দ্রের স্ত্রী-কন্যাকে পদচিহ্নে পৌঁছিয়া দাও।" শান্তি 'তথাস্তু' বলিলেন। "সত্যানন্দ যখন মহেন্দ্রকে স্ত্রীসহবাসের অনুমতি দিয়াছিলেন, তখন সন্তানেরা কেহই তথায় ছিল না।

পরন্তু শান্তিমণি মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া, আপন আবাসে গেলেন। এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, তিনি কল্যাণীর উদ্দেশে সেই গভীর রাত্রেই নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেদিকে রাজ্যজয় হইয়াছে মনে করিয়া, যে সকল পতঙ্গবুদ্ধি সন্তানেরা, পল্লীগ্রাম লুণ্ঠন করিবার মানসে গমন করিয়াছিল, তাহারা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘোর চাৎকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিল। "মহারাজ সত্যানন্দের জয়—বাঙ্গালীর রাজ্য হইল, মুসল্‌মান গোল্লায় গেল, বল সবে 'বন্দেমাতরম্।' সন্তানদের আনন্দবিকাশী উৎক্রোশে বরেন্দ্র-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল। হিন্দু-মুসল্‌মান সকলেই সন্তানদের অত্যাচারে ভীত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বাতী জ্বালিয়া জাগিয়া রাত কাটাইতে বাধ্য হইল।

নভেল ঠাকুর বলিতেছেন।—"সন্তানেরা বাড়ী বাড়ী চুরি, ডাকাতী ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল "আমরা ব্রজগোপ আসিয়াছি—গোপিনী কই ?" (একি ঠাকুর, তুমি না বলিয়াছ সন্তানেরা ইন্দ্রিয় বিজয়ী!—তবে কি ইন্দ্রিয় বিজয়ী শব্দের অর্থ, সেইরূপ যেরূপ জীবানন্দ অর্থ করিয়া শান্তিমণিকে শোনাইয়াছিলেন। ঠাকুরের হজমশক্তি নাই, অথচ বদহজমা জিনিষ গুলা খাইয়া 'পেট কীলাইতেও' ছাড়েন না।) সত্যানন্দ সন্তানদিগকে পরস্ত্রী হরণ করিবার অনুমতি দেন নাই। কাজেই বলিতে হইবে যে, সন্তানেরা চিরদুষ্ট কামোপাসক। তাহারা লোকের স্ত্রী-কন্যা লইয়া যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে লাগিল। ঘোর অত্যাচারের ভয়ে, মুসল্‌মানেরা দাড়ি মুড়াইয়া, গায়ে মাটি মাখিয়া, গেরুয়া বসন পরিয়া, 'হরিনাম জপিতে লাগিল। আপসে বলাবলি করিতে লাগিল। "আল্লা হো আকবর!—এতনা রোজের পর কোরাণ শরিফ কি বেবাক ঝুটা হইল ?—মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নামাজ করি, তা এই তিলক কাটা হেঁদুর দলকে ফতে করতে নারলুম। দুনিয়ার সব

ঠাকুর বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। যখন উড়িষ্যা ভাষা বলেন, তখন কে বলিবে তিনি পালকী-বেহারা নন।—তবে মুসলমান ভাষা বলিবার সময়, বোধ হয় যেন তিনি 'দু-আসলা' মুসলমান।—যাহা হউক তিনি নানা ভাষার অনুকরণ অবিকল করেন, তাহা স্বীকার করি। তাঁহার দু-আসলা খোট্টা দারবানের ভাষাটাও অতি পরিষ্কার।)

(ঠাকুরের মৃত্যুর সামান্যদিন (দশ বিশ বৎসর) পরই যে, দেশের বাতাস ফিরিয়া যাইবে হিন্দু-মুসলমানে একতা করিবার মহা আন্দোলন প্রকাশ পাইবে;—এত নিকটবর্ত্তী কথার কল্পনাও তাঁহার স্থূলবুদ্ধিতে প্রকাশ ছিল না। ভাই ভাইয়ের বিবাদ যে বহুদিন স্থায়ী হয় না, এই সামান্য কথা বুঝিবার শক্তি, যদি তাঁহাতে থাকিত তবে কি তিনি, 'মার নেড়ে' বলিয়া, গাঁজার নেশায় মুসলমানদের মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িতেন! অতএব যখন এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তাঁহার কল্পনা সকল নিতান্ত গর্হিত, বিবাদ বর্দ্ধক, অসার ও ভ্রান্তোৎপাদক বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গেল এবং এই সকল কল্পনা যখন আমাদিগকে ফাঁসকাট ও কালাপানি পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিল, তবে এখনও আমরা ঐ সকল পুস্তক কালাজলে প্রক্ষিপ্ত না করিতেছি কেন? ইহাতে আমরা কি আমাদের স্থূলবুদ্ধির পরিচয় দিতেছি না? এতেও যাঁহারা বলিবেন যে, দেশ এইরূপ মন্দভাবে গঠিত হইবে, কবি তাহা জানিতে পারিয়া, ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা বলিব তাঁহাদের মাথার ভ্রান্তি পাকিয়া জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গিয়াছে। সে ধারণা মরিলেও ফিরিবার নহে। অতএব এই রূপ গ্রন্থের পাঠে আমাদের জাতীয় শক্তি যে কত পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, তাহা কি চিন্তার বিষয় নহে? সে চিন্তা করিবার লোক কি বঙ্গদেশে নাই?)

১৬ * কল্যাণীর কল্পনা। * ১৬

কল্যাণী ঘরে বসিয়া শুনিলেন, সন্তানদের জয় হইয়াছে। বঙ্গরাজ্য হিন্দুরাজ্য হইয়াছে, তিনি পাঁচজনের সেবা করা হইতে বাঁচিলেন মনে করিয়া আনন্দিতা হইলেন। তিনি ভবানন্দের হইয়া থাকিবেন কি মহেন্দ্রের হইবেন, সেই কথা মনে মনে মীমাংসা করিতে লাগিলেন। শেষে ভবানন্দের হইয়া থাকাই স্থির করিলেন। এমন সময়ে একদল সন্তান, ভবানন্দের মৃত্যু-সংবাদ, হৃদয়বিদারী-ভাষায় ঘোষণা করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছে। কল্যাণী শুনিয়া বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের

তিনি আপনাকে বিধবা মনে করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রাণ এতদূর চঞ্চল ও বিকলিতচিত্ত হইল যে,—সেই নিশার গভীরে, উদাসিনীর ন্যায় একাকিনী গৃহত্যাগ করিয়া আনন্দবনে গমন করিতে উন্মতা হইলেন। স্বীয় সতীত্ব সম্বন্ধে এই ভাবিয়া লইলেন। "পথে অন্য আর কে ধরিবে, ধরে তো সন্তানেরাই ধরিবে।—তারা দেশোদ্ধারকারী বীর, তাদের 'মুখমিষ্ট করায়' পুণ্য বই পাপ নাই।"

(সম্রাট ঠাকুর বলেন, এই ভদ্রলোকের মেয়ে, জমিদারের গৃহলক্ষ্মী, মহেন্দ্রের নিকট পদচিহ্নে যাইবার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছিলেন।—তাই যেন সত্য! তা রাত দুপুরে কেন ঠাকুর? পথ-ঘাট চতুর্দ্দিক দস্যু ও লম্পট বিবৃত, আজ রাত্রে না গেলে ক্ষতি কি হইত?—আর পদচিহ্ন গ্রামটি কি আনন্দবনের ভিতর?)

কল্যাণী প্রথমতঃ এক পাঁড়ে পাহারাওয়ালার হাতে পড়িলেন, সে যৎসামান্য নাকড়া-ঝাঁকড়া দিয়া কল্যাণীকে ছাড়িয়া দিল। তিনি পথপর্য্যটন করিয়া চলিলেন। বনের নিকটবর্ত্তী হইলে, এক সন্ন্যাসী 'ওবে চাঁদ' বলিয়া তাঁহার হাত ধরিল। তাঁহার মনস্কাম সিদ্ধ হইল কি না, জানি না। আর এক সন্ন্যাসী আসিয়া প্রহার করিয়া প্রথম সন্ন্যাসীকে তাড়াইয়া দিয়া কল্যাণীকে বলিল—"তুমি নির্ভয়ে আমার সহিত আইস।" কল্যাণী হয় তো মনে করিলেন যে, এবার তিনি চাষাড়ে প্রেম হইতে এড়াইয়া, ভদ্রলোকের প্রেম পাইলেন। তিনি কোন আপত্তি না করিয়া দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর সহিত চলিলেন। কতকদূর যাইয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কোথা যাইবে।" কল্যাণী বলিলেন। "পদচিহ্ন গ্রামে।" সন্ন্যাসী তাঁহার দুই স্কন্ধে দুই বাহু স্থাপন করিয়া মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, চুম্বন করিবার মানস দেখাইলেন। কল্যাণী কি আর সে কল্যাণী আছেন যে, তিনি পুরুষ দেখিলে আতঙ্কিতা হইবেন। তিনি এখন এমন মনে করেন যে, তাঁহার কল্যাণেই সন্তানেরা জননীজন্মভূমির উদ্ধার করিয়াছেন। সন্ন্যাসী কতক্ষণ তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন। "চিনিয়াছি, তুমি পোড়ারমুখী কল্যাণী।" এই বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।

কল্যাণীও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন। "কে, শান্তিমণি নাকি?—পুরুষ হ'লি কবে?" শান্তি বলিলেন। "পুরুষ হইয়াছি বলিয়াই তো তোর উদ্দেশে ঘুরিয়া মরিতেছি।" (পাঠক এইবার চিন্তা করুন, আনন্দমঠ গ্রন্থের কোন স্থলে শান্তি ও কল্যাণীতে আলাপ হইতে দেখিয়াছেন কি?—তবে এই প্রগাঢ় আলাপ তাঁহাদের মধ্যে কেমন করিয়া হইল?—আমাদের পাঠশালার পরিচ্ছেদগুলি এখনও কি অনুমোদন করিবেন না?—কীর্ত্তি দেখিলেই কর্ত্তাকে ধরা যায়। ঠাকুর গোড়ার পরিচ্ছেদগুলি গিলিয়া ফেলিয়া, অনেক দূরে আসিয়া তাহা উদ্গীরণ করিয়াছেন।)

শান্তিমণি কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আবাসে পৌঁছিয়া

লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় মহেন্দ্রের উপর ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণী মহেন্দ্রের উপর পড়িয়া যাইতেই তাঁহার চেতনা হইল। তিনি শান্তির অনেক সুখ্যাতি করিয়া, সস্ত্রীক পদচিহ্ন যাত্রা করিলেন।

পরদিন জীবানন্দ, নিমাইয়ের নিকট হইতে কন্যা আনিতে গমন করিলেন। নিমাই সেই কন্যার মায়ায় অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন জীবানন্দ, নিমাই এবং তাঁহার স্বামী উভয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেই কন্যাসহ, পদচিহ্নে গমন করিলেন। এবং সকলেই সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

পুরুষবেশা শান্তি, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, পরন্তু কল্যাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না।—একদিন কল্যাণী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান, তাহাতে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে চান। দ্বারবানেরা নিষেধ করিলে, তিনি বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা মহেন্দ্রকে বলিল। "এক জন সন্ন্যাসী বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছে।"—মহেন্দ্র শুনিয়া কুপিত হইলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নবীনানন্দ কল্যাণার সহিত হাতাহাতি মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, দুইজনেই বেশ রসের কথা বলিতেছেন। (নভেল ঠাকুর এখানে বেশ একটি রঙ্গ দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই রঙ্গের মধ্যেই বেশ প্রকাশ পায় যে, মহেন্দ্র ভবানন্দকে অবিশ্বাসী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কল্যাণীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিতে পারেন নাই। আইনজ্ঞ নভেল ঠাকুরের আইনমত কল্যাণী দোষী হইতেও পারেন না।—ভবানন্দ চোর, কল্যাণীর প্রেম চুরি করিয়াছিলেন। যে চুরি করে সেই চোর, সেই দোষী, সেই অপরাধী হয়; দণ্ড তাহারই হইয়া থাকে। যাহার চুরি যায়, সে চোর কিসে, সে অপরাধী কিসে? তাহার দণ্ড কোন আইনেই নাই।—নভেল ঠাকুর দণ্ডবিধি আইন দেখাইয়া, কল্যাণীকে সাবিত্রী প্রমাণ করিয়া দিলেন।—আর ঐ আইন মতে ঠাকুরের অন্যান্য গ্রন্থে শৈবলিনী, পদ্মাবতী, প্রফুল্ল, শ্রী, মনোরমা, মৃণালিনী, সূর্য্যমুখী, হীরা প্রভৃতি সাবিত্রী প্রমাণীকৃত হইয়াছেন।—আমরা আইন বুঝি না তাই ঠাকুরের নিন্দা করি।)

১৭ * কল্পনায় রাজ্যজয়। * ১৭

নভেল ঠাকুর বলিতেছেন। "উত্তর বাঙ্গালা মুসল্মানদের হাতছাড়া হইয়াছে। এ কথা মুসল্মানেরা মানেন না, তাঁহারা মনকে চোক ঠারেন। (কেবল মানেন তাঁহারা যাঁহারা কল্যাণী ও শান্তিদিগকে সতী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন,

মনে করিতে পারেন।) কাপ্তেন টমাসের স্থলে মেজর এডওয়ার্ডস্ সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী-দস্যুদের হাত ছিচড়ামী বুঝিতে পারিয়াও, সহসা পদচিহ্ন দুর্গ আক্রমণ উচিৎ বিবেচনা না করিয়া, মনে মনে এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।—মাঘীপূর্ণিমার দিন, তাঁহারই শিবিরের নিকটবর্ত্তী যে মেলা বসিবে, সেই মেলায় পলাতক ডাকাতেরা জাঁক-জমকের সহিত মেলা দেখিতে আসিবে। তখন তিনি সহজেই সেই ভণ্ডদলকে যমালয়ের দ্বার দেখাইয়া দিতে পারিবেন। পরন্তু তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "এক ঠাঁই সকল বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।" এই সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

সন্তানেরা সকলই হারাইয়াছে, মেলাটিও কি হারাইবে! (এ কি ঠাকুর, আমরা যে সন্তানদিগকে জয়ী হইতে দেখিয়াছিলাম! তাঁহারা উত্তর বঙ্গের রাজ্য পাইয়া গেল,—তবে আবার এ কি বলিতেছেন! এমন করিয়া কাণ ধরিয়া যেদিকে মামার বাড়ী, আবার সেই দিকেই বাবার মন্দির দেখাইতে লাগিলেন কেন? ঠাকুরের দেখাদেখি আমরাও লোককে আশা দিয়া আকাশে তুলিতে এবং শেষে গলায় পা দিয়া পাঁকে পুতিতে ছাড়ি কি? ঐরূপ করিয়া আমরা সম্রাট না হইতে পারি, গ্রাম্য মণ্ডলও তো হইতেছি! আমরা তাই বলিয়া বেড়াই 'ভাল করিতে পারিব না, মন্দ করিব তায় কি দিবি দে।') সন্তানেরা দলে দলে মিলিয়া মেলা রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। মহেন্দ্রসিংহ যোগদান করিলেন। জীবানন্দ এবং শান্তি, ইহারা সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা এক টিলা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের পথ সেই টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। তাঁহারা সেই পথ ধরিয়া টিলায় আরোহণ করিয়া দেখিলেন, টিলার নীচেই ইংরেজ শিবির। পরন্তু তাঁহারা টিলাস্থ এক নিভৃত গুহায় বসিয়া, এক সুন্দর কৌশল আঁটিলেন।

ষণ্ডালী শান্তি যে প্রণালীতে কাপ্তেন টমাস্‌কে, তদীয় যৌবন-জাত রসে রসান্ন করিয়া আনন্দবন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, মেজর সাহেবকেও সেই প্রণালীতে তাড়াইবার উদ্দেশে, এক রস-কলি কাটা ভিখারী বৈষ্ণবী সাজিয়া, তাঁহার তাঁবুতে গমন করিলেন। (রসকলি কাটিবার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সিপাহীদের নিকট হইতে বীজ সঞ্চয় করিবেন। স্ত্রী-সন্তান মাত্রই ঐরূপ করিত। আর সেই রসকলী এখন সকল রমণীরই রুচ্য হইয়াছে।) প্রথমতঃ শান্তিকে লইয়া সিপাহীরা লীলা করিল। তারপর যখন জানিতে পারিল যে, সন্ন্যাসিনীর বাড়ী পদচিহ্ন গ্রামে, তখন সিপাহীরা তাঁহাকে মেজর সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সেই সময়ে কামুক লিণ্ডলে সাহেব সেই শিবিরে বসিয়াছিলেন।

মেজর সাহেব শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "পদচিহ্ন গ্রামের দুর্গে কত সেনা

আছে, তাহারা মেলায় আসিয়াছে কি ?" শান্তি বলিলেন। "সেনা ৫০ হাজার হইবে। তাহারা মেলায় আসিবে কি না, বলিতে পারি না।—তবে যদি ঘোড়া দাও, লোক সঙ্গে দাও, আর আমাকে ৫০০৲ টাকা দাও, তবে, সে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি।" পরন্তু মেজর সাহেবের আদেশে, লিণ্ডলে সাহেব শান্তিকে লইয়া একটা আরবী ঘোড়ার উপর চড়িয়া চলিলেন। (শান্তিকে নভেল ঠাকুর কিরূপে দেবী করিতেছেন পাঠক তাহা বুঝিয়া যাইবেন।)

একটা ফাঁকা মাঠে আসিয়া, লিণ্ডলে সাহেব শান্তিকে বাহুবেষ্টনে ধরিলেন। দুইজনেই তখন বে সামাল হইয়া পড়িলেন। সেই চলন্ত ঘোড়া হইতে দুইজনেই পড়িয়া গেলেন। সাহেব শান্তিকে বুকে করিয়া পড়িলেন, শান্তি তাহাতেই আঘাত পাইলেন না। লিণ্ডলে আঘাত পাইয়াছিলেন, উঠিতে পারিলেন না। শান্তিমণি অশ্বে আরোহণ করিয়া, লিণ্ডলের আরবী অশ্ব লইয়া পলায়ন করিলেন।

(নভেল ঠাকুর এখানে আসল কথা গোপন করিয়া বলিয়াছেন,—"শান্তি অমনি নির্ব্বোধ ইংরেজের গলা ধরিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিলেন।"—বলি ঠাকুর! শান্তি যদি এমনি বীরভুজা, তবে সেই শত্রুকে মারিয়া ফেলিলেন না কেন ?—শান্তি কি একটি ঘোড়া চুরি করিবার মানসে রসকলি কাটিয়াছিলেন ?—আমরা বলি, শান্তি উপপতি হন্ত্রী নহেন। উপপতিই তাঁহার আস্ত জগৎ।)

এডওয়ার্ড সাহেব শীঘ্রই লিণ্ডলের পতন সংবাদ পাইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁবু সকল ওঠাইয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া লইলেন এবং তোপ-গোলা অস্ত্র-শস্ত্র বাঁধিয়া, সৈন্যদলকে সাজাইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রসিংহও ঐ টিলার উপর শিবির নির্ম্মাণ করিবার জন্য আরোহণ করিতেছিলেন। জীবানন্দ গুহা হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "পর্ব্বতের নীচেই ইংরেজ সেনা! যাহারা প্রথম পর্ব্বতাধিকার করিতে পারিবে, তাহারাই জয়ী হইবে।" এই বলিয়া 'বন্দেমাতরম্' গাহিতে লাগিলেন।

সন্তানেরা পর্ব্বতের অর্দ্ধপথ আরোহণ করিতে পারিল না, ইংরাজেরা পর্ব্বত-শিরে পরিশোভিত হইয়া গেল। এবং দিগ্-দিগন্তর কাঁপাইয়া, অবিশ্রান্ত কামান দাগিতে লাগিল। সন্তান-সেনা পঙ্গপাল দলে মরিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহারা তোপমুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া নির্ঝরবৎ নামিয়া পলায়ন করিল। জীবানন্দ গুহার মধ্যে লুকাইলেন। সকলে পলায়নপর হইলে, ইংরেজেরাও নিবৃত্ত হইল। তখন জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া "হরে মুরারে ও বন্দেমাতরম্" গান করিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন।—সন্তানেরা জয়ী হইয়াছে মনে করিয়া (কেন না সকলেই তো

মিলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"মুসল্‌মানদের বুকে পিঠে চাপিয়া মার।" (এখানে দণ্ডবিধি আইন মতে মুসল্‌মান অর্থাৎ ইংরেজ।)

সন্তানেরা ইংরেজদিগের অগ্রপশ্চাৎ হইয়া মারিতে লাগিল। যেমন দুইখণ্ড শিলার সংঘর্ষণে মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, সন্তান-সেনার সংঘর্ষে সেই বিশাল রাজ-সৈন্য নিঃশেষিত হইল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নিকট সংবাদ দিবারও লোক রহিল না। (ঠাকুরের সত্য কথাগুলি, আমরা ইতিহাসেও অনুরূপ দেখিতে পাই। তাই বুঝি ঠাকুর তাঁহার তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে, ইংরেজী ধরণে প্রকাশ করিয়াছেন। "উপন্যাস, উপন্যাসই, ইতিহাস নহে।" ঠাকুর কি মনে করেন, উপন্যাস লিখিবার কোন সীমা নাই? যাহা মুখে আসে উপন্যাসে তাহাই বলা যাইতে পারে। বাবাকে বোনাই, বোনাইকে বাবা, কন্যাকে পত্নী, পত্নীকে কন্যা, জামাতাকে শালা, শালাকে শ্বশুর, নভেল লিখিতে এ সকল চলে না কি?—তাই তিনি অবাধে ঐরূপ বলিয়া গিয়াছেন, এমন একটা মহা ব্যাপার ইতিহাসে নাই কেন? একটা বন্য-কুকুরেরদলকে তাড়াইয়া বা প্রাণে মারিয়া, ইংরেজেরা সে গৌরব ইতিহাসে প্রকাশ করিবার মত নীচমানা-সম্প্রদায় নহেন।)

মওয়াক্কেলের টাকা খাইয়া, তাহার তরফ হইয়া, আদালতে দাঁড়াইয়া মিথ্যা বলা উকিলদের জন্য বিধেয়, তা বলিয়া, তিনি তাঁহার মওয়াক্কেলের বিপক্ষী ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা লইয়া, মওয়াক্কেলের সর্ব্বনাশ করিতে দাঁড়াইতে পারেন না।—তাহা যদি বিধেয় হয়, তবে নভেল ঠাকুর বোনাইকে শালা বলিয়া দোষ করেন নাই।)

মাঘ মাসের পূর্ণিমারজনী। বনস্থল এক ভীষণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। হতাহত, অর্দ্ধাহত, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসল্‌মান, বাঙ্গালী, হাত ভাঙ্গা, পা ভাঙ্গা, মুখ থেত, দেহ থেত, জীবন্তে-মৃতে, মনুষ্যে-অশ্বে, মিশামিশি, ঠেসাঠেসি, হইয়া পড়িয়া আছে। শান্তিমণি কাঁদিতে কাঁদিতে একটি আলো হাতে করিয়া, সেই স্তূপীকৃত শবরাশির মধ্যে জীবানন্দের শবদেহের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক স্বর্গীয়-সম্ভব মহাপুরুষ (নন্দকুমার নহে কি?) আসিয়া শান্তিকে শান্ত করিয়া, নিজে সেই শবদেহ বাহির করিয়া দিলেন। এবং তিনি কি এক ঔষধ দিতে, জীবানন্দ ক্রমশঃ জীবন পাইলেন। জীবানন্দ প্রথম কথা কহিলেন। "যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইল?" (জীবানন্দ মরিল কখন?)

শান্তি বলিলেন। "তোমার জয় হইয়াছে। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।" মহাত্মা তখন অদৃশ্য হইয়াছেন, পরন্তু প্রণাম করা হইল না। (নভেল ঠাকুর আকারেঙ্গিতে সাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার জন্য, এমন ভাবে বলিতেছেন যেন, তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ আসিয়াছিলেন। এই রকম আর একদিন সত্যানন্দকে দেখা

দিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সহিত যাইতে বলেন। সত্যানন্দ তাহাতে উত্তর করেন। "হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন, মাঘি-পুর্ণিমার দিন আপনার আজ্ঞা পালন করিব। (ইনি যে কে আসিয়া মাঝে মাঝে সত্যানন্দকে সাক্ষাৎ দিয়া যাইতেন। নভেল ঠাকুর এ ব্যক্তির কোনই পরিচয় দেন নাই। ভাবে দেখাইয়াছেন মহাপুরুষ।)

(সেই সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে এক মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার নাম রাজা নন্দকুমার, তিনি ইংরেজদের পরম শত্রু ছিলেন। হেষ্টিংস্ সাহেবকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। লোকটি এমন জালিয়াত ছিলেন যে, ১৭৭৫ সালে তাঁহার ফাঁসি হইবার পর তাঁহার ঘর হইতে রাশীকৃত শীলমোহর পাওয়া গিয়াছিল! সে সময়ে যত রাজা, নবাব, সুবা, বেগম, রাণী ছিলেন, তিনি সকলেরই নাম জাল করিতে পারিতেন। কেবল যে, জালের জন্যই তাঁহার ফাঁসি হইয়াছিল তাহা নহে। তাঁহার আর এক সদ্গুণ এই ছিল, ইংরেজ দ্রোহীর সৃজন করিতে পারিতেন।—ইংরেজকে তাড়াইবার, তাঁহার পেটভরা বুদ্ধি ছিল। জনসাধারণকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্যপথে টানিয়া লইতে তিনি পরম পারদর্শী ওস্তাদ ছিলেন। তিনিই সত্যানন্দের গুপ্ত নেতা। সুচতুর হেষ্টিংস্ সাহেব তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেম। যখন সত্যানন্দ কাপ্তেন টমাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছত্রিছন্নি হইয়া যান, তখনই নন্দকুমার তাঁহাকে ইংরেজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সত্যানন্দ মাঘি-পুর্ণিমার দিন, আর একটি যুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত দিতে চাহিলেন না।)

জীবানন্দ ঔষধের গুণে শীঘ্রই সবল হইয়া উঠিলেন, এবং সত্যানন্দের নিকট গমন করিতে চাহিলেন। পাছে জীবানন্দ বঙ্গবালার মোহে পড়িয়া যায়, তাই শান্তি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। "যখন দেহ ত্যাগ করিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ, তখন আবার সন্তান-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, মাতৃসেবায় যোগদান করিলে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে না। আর রণস্থলে কেহ তোমায় দেখিতে পায় নাই (কেন না তখন তুমি গুহার মধ্যে লুকাইয়াছিলে।) এখন দেখিলে সন্তানেরা তোমায় কি বলিবে?—আমরা আর কাহাকেও মুখ না দেখাইয়া, চল হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া সন্ন্যাসীরূপে বাস করিগে।" পরন্তু তাঁহারা তাহাই করিলেন।

(নভেল ঠাকুর বোমা-সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত এবং এই রণে, সন্তান-সম্প্রদায়ের জয় দেখাইয়াছেন, কিন্তু উভয় রণেই সন্তান-সম্প্রদায় কুকুর-মারা হইয়াছিল। তোপের মুখে তুলারাশির ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল।—জীবানন্দ ভয়ে গুহার মধ্যে লুকাইয়াছিল। রণের অবসানে গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া শবদলের মধ্যে শয়ন করিয়াছিল।—মজা বুঝিলেন কি?)

১৮ * বঙ্গবালার তৃতীয় নেকাহ্। * ১৮

(নভেল ঠাকুর সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। সন্তান-সম্প্রদায়কে লইয়া যে সকল, কাল্পনিক বল-বীর্য্য, দম্ভ-কৌশল, ক্ষমতা-শক্তি, লম্ফ-ঝম্ফ দেখাইতেছিলেন, তাহা তাঁহার ফুরাইল, এখন কি বলিয়া জনসাধারণকে মুখ দেখাইবেন, সেই চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছেন।—ঠাকুর এখন, সেই 'বন্দেমাতরম্ এবং হরে মুরারে' গান ভুলিয়া গিয়াছেন, মুসল্‌মানদিগকে সবংশে নিপাত করিবার কথা ভুলিয়াছেন, তাহাদের বুকে পিঠে চাপিয়া মারিবার কথাও মনে নাই।—মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া রাধা-মাধবের মন্দির গড়িবার কল্পনা গিলিয়া ফেলিয়াছেন। দুষ্টের দমন ও ধারিত্রীর পালন কথাটা স্বপ্নবৎ হইয়া গিয়াছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কথাটা গিলিয়া ফেলিয়াছেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গভর্ণর জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইলে পর, সন্তানেরা দুইবার ইংরেজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে কথা ও মস্তিষ্ক হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সমুদয় স্মরণশক্তি হারাইয়া কি করিলে ইংরেজ প্রভুর মন রাখিতে পারা যাইবে, ঘোর বিকলিতচিত্তে, তাহারই চিন্তায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। অনেক চিন্তার পর ঠাকুরের বেহায়া কলম লিখিতে লাগিল।—

"সেই মহাপুরুষ বৈকুণ্ঠনাথ (নন্দকুমার) এখনও জাল দায়গ্রস্ত হইয়া আছেন। জাল দূরের কথা, তিনিই যে সন্তান-সম্প্রদায়ের মূল মালিক ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তাই তাঁহাকে সন্তান-বিদ্রোহ তুলিয়া দিবার 'চাড়' পড়িয়াছে।" তাই তিনি আনন্দমঠে আসিয়া সত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন। "আজ মাঘি-পূর্ণিমা—তুমি আমার সহিত চল।" সত্যানন্দ বলিলেন, "যাইতে প্রস্তুত।—এত যত্নের রাজ্য, এর দশা কি হইবে?" (ঠাকুরের জয়ী হওয়া নেশাটা এখনও কাটিতেছে না।) বৈকুণ্ঠনাথ বলিলেন। "দস্যুবৃত্তিদ্বারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। ইংরেজ-রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। (ইংরেজ-রাজ্য স্থাপিত হইবার পরও যে সন্তানেরা যুদ্ধ করিয়াছিল, ঠাকুরের সে কথা আদৌ মনে নাই।—সন্ন্যাসীরা এতদিন কি ইংরেজ-পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিতেছিল না কি?)

(এতদূর বিস্তারিত ভাবে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সকল দেখাইয়া দিলাম, তথাপি যদি কাহারও মনে এমন সন্দেহ হয় যে, 'আনন্দমঠের' অনুকরণে 'বন্দেমাতরমের' দল সৃষ্ট হয় নাই, তবে তিনি যেন আমাদের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর করেন।—

রচনা করিলেন? যাহা আমরা তাঁহারই কথায় শতস্থলে দেখাইয়া দিয়াছি। (২) কি উদ্দেশ্যে চিরভীরু বাঙ্গালীকে মহাবীর করিলেন? (৩) পরাভূতিকে জয় বলিয়া দেখাইয়া দিলেন কেন? কি উদ্দেশ্যে কামুক দস্যুদলকে ধার্ম্মিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন? (৪) এই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে নাই কেন? (৫) বৈকুণ্ঠনাথ—সে কে? যদি ঔষধের জোরে জীবানন্দ ও কল্যাণী বাঁচে, তবে সন্তান-সেনারা রণে মরে কেন? এ সকল চিন্তা করিবার মাথা বঙ্গদেশে নাই কি?)

লিণ্ডলে সাহেব ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলে, অনেক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া তথা হইতে আনন্দবনে আসিলেন এবং শান্তিকে তথায় পাইবার প্রত্যাশায় ক্রমশঃ গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। বন তখন একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। তথাকার মঠ দেখিয়া সেই মঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বঙ্গবালা একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। লিণ্ডলে বাঙ্গালা ভাষা বলিতে পারিতেন। তিনি বঙ্গবালাকে সান্ত্বনা দিলেন। বঙ্গবালা আপনাকে বঙ্গদেশ বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্তানেরা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিল না, অগত্যা তাঁহাকে ইংরেজস্বামী করিতে হইবে। তিনি লিণ্ডলেকে দেখিবামাত্র স্বামী বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সমুদায় ভাণ্ডারজাত ধন দেখাইয়া দিলেন। এবং দর্পণশ্রেণীর কৌশল-কর যোজনায় যে ভাবে সেই মন্দিরটিকে ভৌতিক-লীলার ভাণ্ডার করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাও একে একে দেখাইয়া দিলেন।

সন্তান-সম্প্রদায়ের নাম-নিশান মাত্র রহিল না। কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা একাল পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারিল না।—কিসে বঙ্গরাজ্য, বাঙ্গালীর রাজ্য হইবে, এই পতিত কল্পনা মাথায় স্থান দিয়া, নভেল ঠাকুর তাঁহার ১৪ খানি নভেল লিখিয়াছেন।—তাঁহার কল্পনা অতি জটিল ও দুরভিসন্ধি-যুক্ত অহিতকর। কল্পনা ভাল হইলে, দেশের লোকের কল্পনাও ভাল হইত। কল্পনা অতি জঘন্য বলিয়া এই সকল পুস্তকের পাঠে দেশ মন্দ ভাবে গঠিত হইতেছে।—পুস্তকগুলি হিন্দু-মুসল্মানে বিবাদ বাধাইবার মস্ত উপাদান। আমরা হিন্দু-মুসলমান, এক মন, এক প্রাণ, ভাই ভাই হইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছি। আমাদের শুভকার্য্যে, যদি এই পুস্তক সকল বিঘ্ন হইয়া না দাঁড়াইত, তবে আমরা এতদিনে কতদূর উন্নতি করিতে পারিতাম, তাহা কেহ চিন্তা করিতে পারেন কি?